মহাস্থানের কিংবদন্তি

সাহিদা বেগম

CamScanner

সাহিদা বেগম ১৯৫৫ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের বিনারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা- মরহুম আলহাজ্ব আনোয়ার আলী ভূঞা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। মা আলহাজ্ব হাসনা হেনা বেগম গৃহিণী। গবেষক প্রাবন্ধিক ও আইনজীবী সাহিদা বেগম ১৯৭০ সালে গাইবান্ধা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৭৩ সালে সিদ্ধেশ্বরী মহিলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান (বাংলা সাহিত্য) ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে লাভ করেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ১৯৮৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন এন এন বি ডিগ্রি।

কর্মজীবন : ১৯৮৫ সালে আইন ব্যবসা শুরু করেন ঢাকা বারে যোগ দিয়ে। ১৯৮৮ সালে যোগ দেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বারে। অদ্যবধি আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সহকারী এটর্নী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

'স্বদেশ, ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধ' সাহিদা বেগম এর রচনার মূল বিষয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর রচনার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ১৬টি গ্রন্থসহ ৬৯টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থ 'যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস' ১৯৮৪ সালে বছর ব্যাপি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন ▶

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
www.ananya-books.com

© ২০১৮ লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ১৫০.০০ টাকা

ISBN 978 984 432 501 2

Mohasthaner Kingbodonti by Shahida Begum
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : August 2018, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 150.00 Taka Only

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে অনন্যা'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

ভূমিকা

বাংলাদেশ সাগর উপকূলবর্তী একটি পলিমাটির দেশ। বহু বছর আগে, এই খ্রিষ্টজন্মেরও আগে কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড় এমনি আরো অনেক ছোট ছোট নৃগোষ্ঠী বাস করত। পলিমাটির দেশ বলে এ-অঞ্চল ছিল বনজঙ্গলে আবৃত। আর সেই সব জঙ্গলে বাস করত হিংস্র সব জীবজন্তু। বাঘ, সিংহ, সাপ আরো সব বন্য প্রাণী। এই সব বনজঙ্গলের আশেপাশে, নদীর ধারে বাস করত মানুষ। বনজঙ্গল থেকে প্রায়ই বন্যসিংহ বাঘ-সিংহ লোকালয়ে এসে মানুষ খেয়ে ফেলত। বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছিল মানুষের চলাচলের রাস্তা সুতরাং চলাচলের সময়ও অনেকে বাঘের পেটে চলে যেত। মানে বাঘ খেয়ে ফেলত মানুষকে। তাই বন্য হিংস্র প্রাণীদের সাথে লড়াই করেই তখনকার মানুষকে বেঁচে থাকতে হতো। তবে বনেজঙ্গলে তো শুধু এইসব হিংস্র বাঘ-ভাল্লুক-সিংহই বাস করত না। ওদের সাথে ছিল হরিণ, বুনো হাঁস, আরো কত পাখ-পাখালি।

তখনকার দিনে বাংলাদেশের বর্তমানে বগুড়া জেলার কাছে একটি জায়গার নাম মহাস্থানগড়। এই জায়গাটি ছিল খুবই উন্নত। সে-সময় এর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন।

বর্তমান বগুড়া শহর থেকে সাত মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর দক্ষিণ-পূর্ব তীরে প্রায় বিশ-ত্রিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উঁচু লালমাটির ঢিপি পাহাড়ি এলাকা এই মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকে শুরু করে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পুণ্ড্রনগরে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার নির্দশনা যেমন ৩ড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখনো সারা মহাস্থানগড় এলাকা জুড়ে তেমনি এইসব ঐতিহাসিক নির্দশনকে ঘিরে জন্ম হয়েছে অনেক কল্প-কাহিনি-কিচ্ছা। এইসব কিচ্ছা কাহিনি রূপকথার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এগুলো মহাস্থানের কিংবদন্তি। এই বইতে আমি মহাস্থানের পাঁচটি কিংবদন্তির কিচ্ছা বলব।

CamScanner

সূচিপত্র

নল ও নীলা / ১১
রাজা ও শার্দূল বিক্রম ও রানী চন্দ্রমল্লিকা / ১৯
রাজপুত্রের স্বয়ম্বরা সভায় যোগদান / ২৬
রাজা জয়পীর ও কমলা সুন্দরীর উপাখ্যান / ২৯
বেহুলা লক্ষ্মিন্দর / ৩৮

CamScanner

নল ও নীলা

পুরোনো কালের বঙ্গদেশ, আর একালের আমাদের বাংলাদেশ। মহাস্থান এক ঐতিহাসিক জায়গা। বগুড়া জেলা থেকে সাত মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে এই ঐতিহাসিক সুপ্রাচীন শহরটির অবস্থান। এর পুরোনো নাম পুণ্ড্রবর্ধন। বহু বছর আগে এখানে সুন্দর একটা শহর ছিল।

বগুড়া থেকে বাসে করে রংপুর যাওয়ার সময় পথের পাশেই চোখে পড়ে উঁচু এক টিলা। সেই টিলার উপর পীর আওলিয়ার মাজার। হযরত শাহ সুলতান মাহী সাওয়ার (রহঃ) মাজার। চারদিকে বসতি থেকে অনেক উঁচুতে এই শহর। পুরোনো এই শহরটি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মের লোকের কাছেই পবিত্রস্থান। এই শহর, মাজার এগুলোকে নিয়ে এলাকায় এক মজার কাহিনি জড়িয়ে আছে।

এক চাষি জমি চাষ করতে গিয়ে মাটির নিচে পুরোনো দিনের ইট দেখতে পায়। এরপর মাটি খুঁড়ে এই শহর উদ্ধার করা হয়। এই শহর নিয়ে যেমন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা জড়িয়ে আছে তেমনি ছড়িয়ে রয়েছে বেশ মজার একটি গল্পের রূপ-কাহিনি। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সেই কল্প-কথা।

অনেক দিন আগে মহাস্থানের এই জায়গাটি ছিল গভীর বন। বন-জঙ্গলে ঢাকা ছিল স্থানটি। জঙ্গলে একটি ছোট কুঁড়েঘরে বাস করত নল আর নীলা নামে দুই ভাই-বোন। একদিন নল আর নীলা বেড়াতে বেরিয়ে দেখে ডোবার পাশে একটা ব্যাঙ মস্ত বড় এক অজগর সাপ ধরে খাচ্ছে। এই দেখে নীলা অবাক হয়ে নলকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাঙ সাপ ধরে খাচ্ছে এর মানি কী ভাই?

নল বোনকে বলল,
এর একটা মাহাত্ম আছে।
আমাকে বলো সে মাহাত্ম।
নল বলল,— তুমি বুঝবে না সে মাহাত্ম।

নীলা জেদ ধরল, না আমাকে বলতেই হবে মাহাত্মর কথা! বোনের জেদে নল নীলাকে খুলে বলতে শুরু করল সেই মাহাত্মর কথা— এই জঙ্গলে এক রাজ্য গড়ে উঠবে। সেই রাজ্যের মালিক হবো আমি আর তুমি।

এরপর আল্লাহর কুদরতে পর পর আড়াই রাতে সেই জঙ্গলের মধ্যে মাটি ফুড়ে উপরের দিকে উঠে সেখানে বহু দালান কোঠাসহ এক রাজ্য গড়ে উঠল। আর সে রাজ্যের মালিক হলো নল আর নীলা। নল আর নীলা দুই ভাই-বোন মিলে সেই রাজ্যে সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে থাকল।

অনেকদিন বাস করার পর এক দিন নল আর নীলা রাজ্য ভাগ করে নেয়ার কথা ভাবল। নল আর নীলা দু'জনে মিলে সমান দুভাগে রাজ্য ভাগ করল। রাজ্য ভাগ করার পর দু'জনেই রাজ্যের দক্ষিণ অংশ নিতে চায়। দু'জনের মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও কোনো ফয়সালা হয় না। এমন সময় সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল পরশুরাম নামে এক চতুর আর ধূর্ত লোক। দুই ভাই বোন গিয়ে তাকে ধরল— আপনি আমাদের এরাজ্য মেপে এর একটা মীমাংসা করে দিয়ে যান।

পরশুরাম বলল— আমি যদি তোমাদের এই রাজ্য মেপে দিই তবে তোমরা আমাকে কী দেবে?

আপনি যা চান তাই দেবো।

এরপর পরশুরাম অনেকবার অনেকভাবে সেই রাজ্য মেপে দিলো, কিন্তু সেই একই অবস্থা। যতবার যতভাবেই মাপে দু'জনেই দক্ষিণ অংশ নিতে চায়। অনেক চেষ্টা করেও যখন ওদের ভাগ ঠিক হলো না তখন পরশুরাম বলল— আমি আর তোমাদের মধ্যে কাজ করতে পারব না। তোমরা আমাকে বিদেয় করো। নল আর নীলা বলল— আপনাকে কী দিতে হবে? পরশুরাম বলল— তোমরা তো বলেছিলে আমি যা চাই তাই দেবে।

নল-নীলা বলল— ঠিক আছে, যা চান তাই দেবো। তখন পরশুরাম বলল, তোমরা যখন এই রাজ্য ভাগা-ভাগিতে ফয়সালায় আসতে পারছ না তখন রাজ্যটাই আমাকে দিয়ে দাও। রাজ্য থাকলে তোমাদের মধ্যে বিবাদ কখনো শেষ হবে না।

নল আর নীলা বলল, কথা যখন দিয়েছি তখন আমরা আমাদের কথা রাখব।

দু'ভাই বোন তখন পরশুরামকে রাজত্ব দিয়ে মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে পরশুরামকে বলল, আপনি আমাদের কাছ থেকে চালাকি করে রাজ্য নিলেন, আমরা আপনাকে অভিশাপ দিয়ে গেলাম, আপনি রাজ্য সুখে শান্তিতে চালাতে পারবেন না।

নল আর নীলা রাজ্য ছেড়ে চলে গেল আর তখন থেকে পরশুরাম হলো সে রাজ্যের রাজা।

অল্পদিনের মধ্যে পরশুরাম একজন দুর্দান্ত প্রতাপশালী রাজা হয়ে উঠলো। কিন্তু মনে তার শান্তি নেই। সারাক্ষণ নল আর নীলার অভিশাপের ভয়। বাহিরের শত্রু যাতে তার রাজ্য আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য সে রাজ্যের চারদিকে সুউচ্চ এবং সুদীর্ঘ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছিল।

রাজা পরশুরাম তার রাজ্যের অনেক উন্নতি করেছিল। পাকা ইটের রাজপ্রাসাদ। সেসব প্রাসাদে ছোট-বড় অনেক কুঠুরী। রাজ্য রক্ষার জন্য তার ছিল রাজসেনাদল। রাজসেনাদের রাজ্য রক্ষা এবং বসবাসের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল মজবুত দালান কোঠা। মাটির নিচে গুপ্ত ঘর। ধর্মকর্মের জন্য রাজবাড়িতে তৈরি করেছিলেন বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ কালীমন্দির। সেখানে দিন-রাত পূজা-অর্চনা হতো। সে রাজ্যে একটি মাত্র মুসলমান লোক বাস করত। তার নাম ছিল মীর কোরবান আলী। কোরবান আলীর কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না। সে নিঃসন্তান। সে জন্যে তার মনে ছিল খুব দুঃখ।

একদিন কোরবান আলী নামাজ শেষ করে আল্লাহর দরবারে অনেক কান্নাকাটি করলেন, তিনি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে একটা সন্তান দাও তবে আমি তোমার নামে একটি গরু কোরবানি দেবো। আল্লার দরবারে কোরবান আলীর সেই প্রার্থনা কবুল হয়ে গেল যথা সময়ে কোরবান আলীর একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হলো।

ছেলে একটু একটু করে বড় হচ্ছে। এখন কোরবান আলী চিন্তায় পড়লেন— তিনি তো আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছেন গরু কোরবানি দেবেন, কিন্তু পরশুরাম রাজার রাজ্যে গরু জবাই করা নিষিদ্ধ। এখন তিনি কী করবেন?

অনেক চিন্তার পর তিনি করলেন কী— একজনের পক্ষে জবাই করা সহজ এমন একটি গরুর বাচ্চা নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন। জঙ্গলে গিয়ে গরুটিকে কোনো মতে শুইয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে জবাই দিয়ে জঙ্গলেই ফেলে রেখে চলে এলেন। দু-তিন দিন পর গরু পচে গন্ধ ছড়ালো। চিল, শকুন কাক জুটল মাংস খেতে। এক চিল পায়ে করে এক টুকরো মাংস নিয়ে উড়ে এসে ফেলল পরশুরামের রাজমন্দির আর সেই জীবন্তকুয়োর ভেতর। মন্দিরের ভেতর গো মাংস! দেখে সবাই হা-হা, রাম-রাম করে উঠল।

রাজার হুকুম হলো, খোঁজ করো। কোথা থেকে এল এই গো মাংস? খুঁজতে খুঁজতে রাজার লোকেরা সেই জঙ্গলে পেলো গরু জবেহর সন্ধান।

রাজার কাছে খবর গেল। রাজা হুংকার ছাড়লেন— আমার রাজ্যে কে করছে গো হত্যা?

সবাই চিন্তা-ভাবনা করে বের করল, এ রাজ্যে একটাই মাত্র মুসলিম ঘর— মীর কোরবান আলী।

রাজার হুকুম, ধরে নিয়ে এসো কোরবান আলীকে।

কোরবান আলীকে নিয়ে আসা হলো রাজ দরবারে। রাজা পরশুরাম তাকে জিজ্ঞেস করল— তুই করেছিস এই গো হত্যা।

কোরবান আলী— জি-হ্যাঁ।

কেন করেছিস? তুই কি জানিস না, আমার রাজ্যে গো হত্যা নিষিদ্ধ।

জানি।

জেনে শুনে তারপরও করেছিস? এত বড় স্পর্ধা তোর?

উপায় ছিল না। আমার যে আল্লাহর কাছে ওয়াদা ছিল। আমি নিঃসন্তান ছিলাম। আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করেছিলাম— আল্লা যদি আমার একটা সন্তান দেন তবে আমি একটা গরু কোরবানি দেবো।

আল্লাহ আমার সে প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি আমাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছেন। তাই আমি গরু কোরবানি করে আমায় ওয়াদা পালন করেছি।

সব শুনে রাজা পরশুরাম কোরবান আলীকে বলল— যা তোর ছেলেকে নিয়ে আয়।

কোরবান আলী স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলে এনে রাজাকে দিলেন। রাজা তার মন্দিরের বেদীতে কালীদেবীর পায়ে কোরবান আলীর শিশু পুত্রকে জবেহ করলো।

রাজা পরশুরামের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার আর পুত্রের শোকে কোরবান আলী পাগলের মতো হয়ে গেলেন। একদিন আল্লাহর তরফ থেকে কোরবান আলীর কানে এক গায়েবী আওয়াজ এল— 'কোরবান আলী! তোমার প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আল্লাহ একজনকে তৈরি করেছেন, তিনি শীঘ্রই আসবেন। এদেশে এসে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করবেন। তাকে আনতে তুমি চলে যাও ইরাক দেশের বাগদাদ শহরে। তখন বাগদাদ শহরে বাস করতেন শাহ সুলতান। তিনি ভীষণ ভোগ-বিলাসী লোক ছিলেন। সত্তর জন দাসি ছিল তাঁর খেদমতে। ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কে মখমলের বিছানায় ঘুমাতেন।

একদিন সুলতান ঘরে ছিলেন না। তার এক সুন্দরী দাসির খুব লোভ হলো সুলতানের বিছানায় একটু গড়াগড়ি করতে। দাসি সুলতানের বিছানায় গড়াগড়ি করল।

দাসি গড়াগড়ি করার সময় তার রেশমের মতো নরম একটি চুল বিছানায় পড়ে রইল। সুলতান সে বিছানায় শোবার পর তার নরম কোমল পিঠে চুলের দাগ পড়ল। তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। দাসিদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন— তোমাদের মধ্যে কে শুয়েছে আমার বিছানায়? সেই দাসি বলল— আমি হুজুর।

রাগে আগুন হয়ে শাহ্ সুলতান দাসিকে চাবুক মারতে শুরু করলেন। সুলতানের লোক লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে দাসির গায়ে ছ্যাঁকা দিতে লাগল।

হঠাৎ সুলতান অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি যখন দাসিকে চাবুক মারেন তখন দাসি হাসে, আর চাবুক মারা বন্ধ করলে দাসি কাঁদে। তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, এর অর্থ কী? সুলতান দাসিকে জিজ্ঞেস করলেন— আমি মারলে তুমি হাসো আর মারা বন্ধ করলে তুমি কাঁদছ, এই অদ্ভুত ব্যাপার তুমি কেন করছ?

তখন দাসি বলল— আজ আপনি ভোগ বিলাসে দুনিয়াদারির উন্মাদনায় মত্ত হয়ে আছেন। পরকালে আপনার এই ভোগ আর অত্যাচারের হিসেব এর চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে আপনি পেতে পারেন। আল্লাহর বিচার এর চেয়ে কঠিন! ফেরেস্তারা যখন এই ভোগ বিলাসের হিস্যা মেলাতে গিয়ে এমনি করে আপনাকে দোররা মারবে, বেহেস্তবাসীরা আপনাকে দেখে তখন হাসাহাসি করবে। সে কথা মনে করেই আপনি মারলে আমি হাসি আর বন্ধ করলে কাঁদি।

দাসির কথায় হযরত শাহ সুলতানের হুশ হলো। তিনি ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, ঘর-সংসার ত্যাগ করে আল্লাহর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

সেই মুহূর্তে মীর কোরবান আলী সেখানে উপস্থিত হলেন, কোরবান আলী তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। গায়েবী আওয়াজে তিনি এই লোকেরই পরিচয় পেয়েছিলেন। কোরবান আলী শাহ সুলতানকে খুলে বললেন সব ঘটনা। সব শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, রাজাকে তিনি ধ্বংস করবেন এবং সেখানে ইসলাম ধর্মকে জোরদার করবেন।

কোরবার আলীর সঙ্গে তিনি বাগদাদ থেকে রওনা হলেন মহাস্থানের উদ্দেশে। পথে কত বাধা-বিপত্তি। সব বাধা-বিপত্তি জয় করে এলেন তারা

CamScanner

কিন্তু মহাস্থানে এসে সামনে পড়লো সব চেয়ে বড় বাধা— ভয়াল কালীদাহ সাগর। কালীদাহ সাগর যে সে সাগর নয়। এ সাগরে তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ নাগ-নাগিনী সাপ দিনরাত বিষ ঢালছে। সাগরের পানি বিষে নীল। তারা দু'জনে মহা ভাবনায় পড়লেন— এ সাগর পাড়ি দেবেন কী করে?

তারা সাগর পাড়ে বসে ভাবছেন, এমন সময়ে বিরাট এক বোয়াল মাছ ভেসে উঠে বলল, হুজুর আপনারা আমার পিঠে উঠে বসেন, আমি পাড় করে দিচ্ছি। তখন তারা মাছের পিঠে বসলেন।

বোয়াল মাছ অনায়াসে তাঁদের সাগর পাড় করে দিলো। এই জন্যে হযরত শাহ সুলতানকে বলা হয় হযরত শাহ সুলতান মাহি সোয়ার।

তারা দু'জনে পরশুরামের রাজ্যে এলেন কিন্তু আবার ভাবনায় পড়লেন, রাজবাড়িতে ঢুকবেন কী করে? রাজবাড়ির চারদিকে উঁচু উঁচু দেয়াল, শত শত সৈন্য-সামন্ত দিনরাত রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এখানে তো কোনো ভাবেই ঢোকা সম্ভব নয়। তখন শাহ সুলতান ভিখেরীর বেশ ধরে রাজবাড়িতে এলেন।

রাজবাড়ির দরজায় ভিখেরির হাক শুনে রাজার লোক ভিক্ষে নিয়ে এলো কিন্তু সুলতান বললেন— ভিক্ষে নেবো না। আমি তোমাদের রাজার সাথে দেখা করবো। লোক গিয়ে রাজাকে ভিখেরীর মনের ইচ্ছার কথা বলল। শুনে রাজা বলল— আমার দেখা করার দরকার নেই। আমার সাথে দেখা হলে একটু বেশি ভিক্ষা চাইবে এই আর কী! তোমরা ভিখেরীকে এক ঘড়া সোনা, এক ঘড়া মানিক আর এক ঘড়া রুপা দিয়ে দাও।

রাজার লোক ঘড়া ভরা সোনা, মানিক, রুপা নিয়ে ভিখেরীকে দিল।

ভিখেরী বলল, আমি মণি-মুক্তা চাইতে আসিনি, আমি শুধু তোমাদের রাজার সাথে একবার দেখা করতে এসেছি।

লোক গিয়ে আবার রাজাকে জানালো। রাজা বলল, আমি দেখা করবো একটা সাধারণ ভিখেরীর সাথে তা হতে পারে না! তার চেয়ে ভিখেরী যা চায় তাই দিয়ে বিদেয় কর।

ভিখেরী রাজার লোকের নিকট নামাজ পরার সোয়া হাত জায়গা চাইলেন।

রাজা কর্মচারীকে আদেশ দিলেন, যাও ভিখেরীকে মেপে সোয়া হাত জায়গা দিয়ে দাওগে।

রাজার লোক মেপে ভিখেরীকে সোয়া হাত জায়গা দিলো। হযরত শাহ সুলতান সোয়া হাত একটা গরুর চামড়া সেখানে বিছিয়ে নামাজ পড়তে বসলেন।

তিনি নামাজ পড়ছেন তো পড়ছেনই। দিন শেষে রাত এলো, রাত শেষ হয়ে ভোর এলো নামাজ আর শেষ হয় না। নামাজ পড়তে পড়তে সোয়া হাত সেই গরুর চামড়া বড় হতে লাগল। বড় হতে হতে রাজবাড়ির দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

রাজার হুকম হলো, ভিখেরীকে তাড়িয়ে দাও? রাজার লোক এসে ভিখেরীকে চলে যেতে বলল। ভিখেরী মোনাজাত হাতে বলল, আমার নামাজ তো শেষ হয় নাই।

মোনাজাত যত দীর্ঘ হতে লাগল গরুর চামড়াও তত বড় হতে থাকল। রাজা দেখলেন বিপদ! এই বেলা একে না তাড়ালে পরে মহাবিপদ হবে! ভিখেরীকে তাড়াবার জন্য রাজা ভিখেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

রাজার হাজার হাজার সৈন্য এগিয়ে এল আর ভিখেরীর পক্ষে আল্লাহর তরফ থেকে তৈরি হয়ে গেল হাজার হাজার হিংস্র বাঘ।

বাঘে-মানুষে ভীষণ যুদ্ধ!

যুদ্ধ আর শেষ হয় না। হযরত শাহ সুলতান লক্ষ করলেন, বাঘ রাজার যত সৈন্যই হত্যা করে রাজার সৈন্য কমে না। যে সৈন্য মারা যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর আবার জীবন্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসছে।

শাহ সুলতান তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, এইভাবে তো আর পারি না। তোমার রহমত নাজেল কর দয়াময়!

তখন আল্লাহ তাকে জানালেন, রাজবাড়ির ভেতরে আছে এক জীবন্ত কুয়া, সেই কুয়ার পানি খেলে মরা মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে। রাজার মৃত সব সৈন্য নিয়ে সেই কুয়াতে ফেলছে আর সৈন্যরা জীবন্ত হয়ে কুয়া থেকে উঠে আসছে।

শাহ সুলতান প্রার্থনা করলেন, খোদা এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বলেন।

আল্লাহ তাকে জানালেন, এক টুকরা গরুর মাংস সেই কুয়ায় ফেলতে পারলে কুয়ার পানির এই গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

শাহ সুলতান চিন্তায় পড়লেন, রাজার বাড়ির ভেতর গিয়ে কী করে কুপে গরুর মাংস ফেলা যায়, এতো সম্ভব নয়!

আল্লাহ এক চিল পাঠালেন। সেই চিল এক টুকরো গরুর মাংস পায়ে করে নিয়ে উড়ে এসে সেই কুয়ায় ফেললো।

এরপর রাজার মৃত সৈন্যদের কুয়াতে ফেললেও আর জীবিত হতে পারলো না। শাহ্ সুলতানের সৈন্যরা সমস্ত সৈন্যদের মেরে রাজা পরশুরামকে হত্যা করে রাজ্য জয় করে নেয়।

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রাজপরিবারের একটি মাত্র লোক বেঁচে ছিল সে পরশুরাম রাজার বোন শিলাদেবী। শিলাদেবী পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে রাজবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা করতোয়া নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। করতোয়া নদীর সেই ঘাট আজও শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত হয়ে আছে।

এই হচ্ছে মহাস্থানের কল্পকাহিনী। তবে মাটি খুঁড়ে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে সেখানে রাজবাড়ি, মন্দির, মাজার, কথিত কালীদাহ সাগর, শিলাদেবীর ঘাট, জীবন্ত কুয়া এসব নিয়ে মহাস্থানে বর্তমানে একটি সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

রাজা শার্দূল বিক্রম ও রানী চন্দ্রমল্লিকা

পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে রাজত্ব করতেন এক রাজা, নাম শার্দূল বিক্রম। রাজা ছিলেন খুব-ই পরাক্রমশালী। যেমন ছিলেন দেখতে সুপুরুষ তেমনি ছিল তার সাহস, বুদ্ধি, শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী।

শার্দূল অর্থ বাঘ। শার্দূল বিক্রম একবার বাঘের সঙ্গে লড়াই করে দুটো মোটা তাজা বাঘকে হত্যা করার ফলে তার নাম হয় রাজা শার্দূল বিক্রম।

একদিন রাজা শার্দূল বিক্রম শিকার করার উদ্দেশে বনে যান। গভীর বন। চারদিকে শুধু বড় বড় গাছ-পালা-লতা গুল্ম। আর সেই বনে আছে হিংস্র বাঘ-ভাল্লুক। হরিণ বা পাখি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সামনে এসে পড়ল এক বাঘ আর এক বাঘিনী। বাঘের গর্জন শুনেই রাজার সঙ্গী সাথীরা রাজাকে গভীর জঙ্গলে ফেলে সবাই পালিয়ে গেল। বাঘ আর বাঘিনী ঝাপিয়ে পড়ল রাজার উপর। রাজার হাতে শুধু একটি কুড়াল আর একটি তলোয়ার। শিকারের জন্যে যে তীর ধনুক নিয়েছিলেন সেগুলো তো সঙ্গীদের হাতে। এখন কী করেন রাজা? কী করে আত্মরক্ষা করেন? মহাশক্তিধর রাজাও নিজেকে রক্ষা করার জন্যে ঝাপিয়ে পড়লেন বাঘ আর বাঘিনীর উপর। কুঠার আর তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন বাঘ আর বাঘিনীকে। বাঘ আর বাঘিনী রাজার হাতে মারা পড়ল ঠিক-ই তবে রাজাও বাঘ-বাঘিনীর আক্রমণে কম আহত হলেন না। বাঘ-বাঘিনী মরে গেলে বিপদ দূর হয়েছে দেখে রাজার সঙ্গী সাথীরা ফিরে এল। আহত রাজাকে উদ্ধার করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল। রাজকবিরাজ রাজার চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর রাজা সেরে উঠলেন ঠিক তবে, বাঘের ধারালো নখের আচড়ের ক্ষত আর ঘা রয়ে গেল রাজার মুখে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে। এতে সুন্দর রাজা দেখতে বিদঘুটে হয়ে গেলেন। রাজা আয়নায় নিজের চেহারা দেখেন। রাজার মনে খুব-ই কষ্ট অসুন্দর চেহারা দেখে।

একদিন এক কাপালিক বনের ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাজদরবারে এসে উপস্থিত হয়। কাপালিক বলে, আমি রাজার শরীরের এই ঘা শুকিয়ে

CamScanner

দিয়ে রাজাকে পূর্ণ সুস্থ করতে পারব এবং বাঘের নখের আচড় মুছে রাজাকে পূর্ব দেহ সৌন্দর্য ফিরিয়ে দিতে পারব।

রাজকবিরাজ, রাজা, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভাসদ সকলে খুশি হয়ে বললেন, সত্যি তুমি পারবে আমাদের রাজা মশায়কে সুস্থ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। যদি পার তবে তুমি যা চাও তাই দেয়া হবে তোমাকে।

কাপালিক বলল, আমি নিশ্চয়-ই পারব, তবে সে জন্যে আমার কিছু কাজ করার অনুমতি দিতে হবে।

রাজদরবারের সকলে বললেন, কী সে কাজ? শিগ্র করে বল কাপালিক।

কাপালিক বললেন, এই রাজ দরবারের কাছে একটি কুপ খনন করার অনুমতি দিতে হবে। রাজা তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কাপালিক রাজদরবার থেকে কিছু দূরে গিয়ে মাটি খুড়ে একটি বড়কুপ খনন করলেন। তারপর তিন দিন, তিন রাত্র ধ্যান করে কাপালিক কুপের পানিকে এক অলৌকিক শক্তি দান করে। এরপর সেই কুপের পানিতে রাজাকে গোসল করিয়ে মধু ও নাগার্জুন জাতীয় লতাগুল্ম আর বৃক্ষের ছালের রস দিয়ে তৈরি ওষুধ দিয়ে রাজার মুখের আর শরীরের ক্ষতগুলোতে প্রলেপ দিয়ে দিলেন। পনেরো দিনের মধ্যেই রাজা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তখন থেকেই রাজার নাম হলো শার্দূল বিক্রম। এই কুপটি সযত্নে রক্ষা করা হয়। পরে এর নাম হয় জীয়তকুয়া। মানে জীবন্ত কুয়া। এই কুয়াটি এখনো বর্তমান আছে মহাস্থানগড়ে। তবে বর্তমানে সেটা হাজামাজা মৃত কুয়া। তার পানির মাজেজা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন পানিশূন্য শুকনা কুয়া। শুধু অতীতের স্মৃতি ধরে আছে। তো রাজা এবং মন্ত্রীগণ খুশি হয়ে কাপালিককে অনেক উপঢৌকন দিতে চাইলেন। কিন্তু কাপালিক কিছুই গ্রহণ করলেন না। তিনি রাজার কাছে শুধু তার রাজত্বের শেষ প্রান্তে শ্মশানের পশ্চিম পাশে নদীর পাশে একটি জীর্ণ কুঠির তুলে বসবাসের অনুমতি চাইলেন।

রাজা বললেন তথাস্তু।

কাপালিক শহরের বাইরে শ্মশানঘাটে একটি ছোট্ট কুঠির তুলে থাকেন আর ধ্যান করেন। ধ্যানে তিনি এতোটাই শুদ্ধি লাভ করেন যে অনেকে দেখছে আমাবশ্যার গভীর রাতে একটা জ্বলন্ত শ্মশান চিতায় প্রবেশ করে তিনি আকাশের দিকে উঠে যেতেন। চিতার ধোঁয়ায় তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। আবার খুব ভোরে তাকে সেই চিতার প্রায় নিভু নিভু আগুনের পাশে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া যেত। আর পাশের গভীর জঙ্গলের বাঘরা দল বেঁধে এসে কাপালিকের পাহারায় বসে থাকতো।

রাজা শার্দূল বিক্রম খুব প্রজা বৎসল রাজা ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ আর সুশাসন ছিল তার চেষ্টা। কী করে তার প্রজারা সুখে থাকবে এটাই ছিল সবসময়ের চিন্তা।

কাপালিকের সাথে প্রায় প্রতিদিন তিনি দেখা করে রাজনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক সমস্যার সমাধান নিতেন এবং কী করে আরো সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করা যায় তার পরামর্শ চাইতেন।

এমনি করে প্রজাহিতৈশি রাজার সুনাম এবং সৌন্দর্যের কথা আশ-পাশের সব রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এমন রাজারাও মনের গহীনে একটা দুঃখ ছিল। একপুত্রের জন্মের সময় রানী সুভদ্রা মারা যান। রানীশূন্য রাজ্য এখন।

রাজা ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজ্য শাসন করেন আর একমাত্র রাজপুত্র প্রতাব বিক্রমের সেবা যত্ন করে দিন গুজরান চলছিল।

রাজকুমার প্রতাব বিক্রমের বয়স এখন পাঁচ বছর। মাতৃহীন রাজপুত্র মা ছাড়া চাকর দাসিদের কাছে বড় হতে থাকে।

এর মধ্যে একদিন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শার্দূলপুরের রাজার সভাসদরা ষড়যন্ত্র করে তাদের রাজাকে হত্যা করে। রূপেগুণে অনন্যা সুন্দরী চন্দ্রমল্লিকার প্রতি রাজার প্রধানমন্ত্রীর কুনজর পড়ে। চন্দ্রমল্লিকার রূপে প্রধানমন্ত্রী পাগল প্রায় হয়ে ষড়যন্ত্র করে চন্দ্রমল্লিকাকে পাওয়ার আশায় রাজাকে হত্যা করেছে। কিন্তু চন্দ্রমল্লিকা প্রধানমন্ত্রীকে ভালোবাসত না। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা শার্দূল বিক্রমের সৌন্দর্যের এবং রূপগুণের কথা আগেই লোকমুখে শুনেছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে একদিন গভীর রাতে রাজপ্রাসাদের বিশ্বস্ত ক'জন অনুচর আর দাসি নিয়ে বজরায় করে করতোয়া নদীর জাহাজ ঘাটার অতি সুরক্ষিত বন্দরে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয়।

সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর রানী চন্দ্রমল্লিকা রাজাধিরাজ শার্দূল বিক্রমের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

রাজা শার্দূল বিক্রম অনেক আগে থেকেই রানী চন্দ্রমল্লিকার অসাধারণ রূপ মাধুরীর কথা লোকমুখে শুনেছেন। তবে তিনি চন্দ্রমল্লিকাকে চাক্ষুস দেখেন নাই।

রাজা শার্দূল বিক্রম নিজের প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে ক'জন মাত্র অশ্বারোহী সেনাপতি ও সৈন্য নিয়ে করতোয়া নদীবন্দরের একটু উত্তরে একটি নির্জন ও সুরক্ষিত স্থানে যেখানে রানী চন্দ্রমল্লিকার বজড়া বাঁধা আছে

CamScanner

সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজার অনুচর গিয়ে চন্দ্রমল্লিকার বজড়ায় খবর দিলে চন্দ্রমল্লিকা নিজে সহচরীদেরসহ রাজাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করল।

বজড়ার ভেতর এসে রাজা শার্দূল বিক্রম আর রানী চন্দ্রমল্লিকা মুখোমুখি সিংহাসনে বসলেন। রাজা শার্দূল বিক্রম মাটির পানে দৃষ্টি রেখে কথা বলছিলেন রানীর সাথে।

রানী চন্দ্রমল্লিকা বলতে নাগলেন, মহারাজাধিরাজ শার্দূল বিক্রম, আপনি তো জানেন আমরা দক্ষিণের আপনার রাজত্বের অধীনস্থ এক সামন্তরাজা ছিলেন আমার স্বামী চন্দ্রবাহাদুর। আপনি নিজেও তাকে খুব ভালোবাসতেন এবং ভালো জানতেন। কিন্তু আমার স্বামীর প্রধানমন্ত্রী ও আমাদের পূর্বাদিকের ধনুদেশ রাজ্যের রাজা শশাঙ্ক বিক্রমের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমার স্বামীকে হত্যা করে।

রাজা শার্দূল বিক্রম বললেন— রানী আমি কিছু কিছু শুনেছি। আপনার স্বামী ছিলেন নির্দোষ। আপনারই কারণেই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

রানী স্বলাজভাবে নতমুখে উত্তর করলেন, আপনি ঠিকই শুনেছেন। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরি'। তেমনি আমার রূপ যৌবনই আমার দুর্দশার কারণ মহারাজা।

রাজা শার্দূল বিক্রম এবার চোখ তুলে চন্দ্রমল্লিকার দিকে তাকালেন।

রানী চন্দ্রমল্লিকার অসাধারণ দেহসৌষ্ঠব আর রূপ লাবন্য দেখে শার্দূল বিক্রম বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি রানীকে বললেন, রানী আপনি সমস্ত খুলে না বললে, সব ভালো করে বুঝতে পারব না। সব খুলে বলুন নিঃসংকোচে।

রানী বলতে লাগলেন, আমাদের রাজ্য আক্রমণ করার কিছুদিন আগে রাজা শশাঙ্ক বিক্রম তার এক দূতী পাঠিয়েছিলেন আমার প্রাসাদে। প্রথমে সেই দূতী আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করে পরে আস্তে আস্তে অত্যন্ত সুচতুরতার সঙ্গে দূতী কথা বের করার চেষ্টা করে যে, রাজার সাথে আমার বিষময় সম্পর্ক কতবার হয়েছে এবং আমি ইচ্ছে করলে যে কোনো রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা আমাকে রানী বানতে উদগ্রীব। যদি আমি রাজা চন্দ্রবাহাদুরকে ছেড়ে চলে আসি। আসলে আমার সঙ্গে রাজার মাঝে মধ্যে যে মতানৈক্য বা মনকষাকষি ছিল তা আমার অন্দরমহলের কোনো গুপ্তচর সহচরী কথাটা অন্য রাজাদের কাছে পাচার করে দিয়েছিল। রানীর কথা শেষ হলে রাজাধিরাজ শার্দূল বিক্রম চন্দ্রমল্লিকাকে জিজ্ঞেস করলেন অতি বিনয়ের সঙ্গে, এ ব্যাপারে আপনি কী রাজাকে কিছু বলেছিলেন বা তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমায় কিছু জানাতে?

চন্দ্রমল্লিকা লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি যে, আমি কতটা বোকা আর অজ্ঞ ছিলাম। রাজাধিরাজের দৃষ্টি একপলকের জন্যও রানী চন্দ্রমল্লিকার মুখের ওপর থেকে সরল না।

রানী চন্দ্রমল্লিকা সহচরীদের সহায়তায় নিজ হাতে বানানো এক প্রকার ফলের রস খেতে দিলেন রাজাকে।

ফলের রস পান করে রাজা আরো মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এতো স্বাদের ফলের রস তিনি জীবনে কখন পান করেন নাই।

রাজা বিক্রম বললেন, আপনি শুধু অপরূপ সুন্দরীই নন অনেক গুণী রমণী, রাজার রানীরা সাধারণত অলস আর কর্মবিমুখ হয়ে থাকে, আপনি তাদের ব্যতিক্রমধর্মী রানী।

রানী বললেন, রাজাধিরাজ আপনাকে দু'টি অনুরোধ করব। প্রথম, সামান্য উপহার রাজপুত্রের জন্য দিতে চাই। আপনি গ্রহণ করে ধন্য করুন। দ্বিতীয়ত, আমার অনুরোধ, দয়া করে একদিন দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজে অথবা রাতে নৈশভোজে আমি নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াতে চাই আপনাকে। এটা আমার বিনীত নিবেদন।

'রানী চন্দ্রিমল্লিকা, আপনার দু'টি প্রার্থনাই মঞ্জুর। তবে এসব কথা খুব গোপন রাখতে হবে। এ শুধু জানব আমি আর আপনি। কারণ আপনার চারপাশে এখন অনেক গুপ্তচর। সবাই ধনুর্দ্দেশ রাজ্য থেকে গোপনে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আপনাকে অপহরণের জন্যে। তবে আমি করতোয়া দুর্গের সেনাপতিদের ও প্রধান সেনাধ্যক্ষকে সাবধান করে দিয়েছি। তারা আপনার পাহারায় কড়া নজর রাখবে।

রানী বললেন, 'আপনার আদেশ মতোই চলব। রাজা শার্দূল বিক্রম রানীর বজরা থেকে বের হয়ে চারপাশ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে প্রসাদে ফিরে গেলেন।

কিন্তু অপরূপ সুন্দরী রানী চন্দ্রমল্লিকার মুখ এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের সামনে থেকে সরাতে পারলেন না। রাতের ঘুম চলে গেল।

অল্পদিন পরেই রাজা আবার বজড়ায় এলেন। রানীর সঙ্গে দেখা করে গোপন সংবাদটি দিলেন, বললেন, রানী চন্দ্রমল্লিকা, সময় এসে গেছে। আপনার এখানে এই বজড়ায় থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। আমার গুপ্তচর সংবাদ এনেছে; প্রায় এক হাজার সৈন্য দ্রুতগতির ছিপনৌকায় এসে হঠাৎ আক্রমণ করে আপনাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। আজ সন্ধার অন্ধকার নামার সাথে সাথে কয়েকজন মাত্র সহচরী নিয়ে ছদ্মবেশে আমার সৈন্যরা আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে যাবে। আমার সৈন্যসামন্তরা বজড়ার একটু দূরে ঐ

বটগাছের নিচে অপেক্ষা করবে। আর এ সংবাদ আপনি ছাড়া যেন আর কেউ না জানে। আমার সৈন্যরা আশে-পাশেই থাকবে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

রানী চন্দ্রমল্লিকা বললেন, রাজাধিরাজ, আমি অসীম নির্ভরতা পেলাম। বহুদিন যাবত খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। রাতে ঘুমাতে পারতাম না ভয়ে। আপনি আমাকে নিশ্চিত করলেন। বিধাতার কাছে আপনার শুভ কামনা করি। সেদিন সন্ধায় রানী চন্দ্রমল্লিকা শার্দূল বিক্রমের প্রাসাদে গিয়ে উঠলেন রাজার পাঠানো রথে চড়ে। সঙ্গে নিলেন অল্প ক'জন বিশ্বস্ত সহচরী।

রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ দেখে রানী চন্দ্রমল্লিকা খুবই খুশি হলেন। রাজাকে তার আরো ভালো লাগল। তিনি ভাবলেন, রাজার ভালোবাসা তার প্রতি আরো দৃঢ় হবে যদি তিনি রাজপুত্রের ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন।

রাজপ্রাসাদে ঢোকার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে তিনি প্রথমে গেলেন রাজপুত্র প্রতাব বিক্রমের ঘরে। রাজপুত্রকে অনেক খেলনা এবং আরো কিছু উপহার দিলেন। নতুন পোশাক দিলেন। তাকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর আর গল্পের ভাব জমিয়ে ফেললেন রাজপুত্রের সাথে। তিনি চন্দনবতী দিয়ে প্রতাবকে গোসল করালেন নিজ হাতে। তারপর সুন্দর পোশাক পরিয়ে রাজা, রাজপুত্র ও রানী একত্রে খেতে বসলেন। মাতৃহারা রাজপুত্র রানী চন্দ্রমল্লিকার কাছে মায়ের আদর স্নেহ পেয়ে অত্যন্ত খুশি।

পরদিন রাজা চন্দ্রমল্লিকা এবং রাজপুত্রকে নিয়ে শ্মশান ঘাটের সেই কাপালিকের কুঠিরে গেলেন। রাজা কাপালিকের কাছে রানী চন্দ্রমল্লিকাকে বিয়ে করার পরামর্শ এবং অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

কাপালিক একা রানী চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।

রাজা ব্যবস্থা করে দিলেন।

কাপালিক দীর্ঘক্ষণ চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় আলাপ আলোচনা করার পর রাজাকে অনুমতি দিলেন, তুমি একে বিবাহ করতে পার। এ নারী খুবই সুলক্ষনা রমণী। এ রানী হলে দেশের প্রভুত উন্নতি হবে। প্রজারা সুশাসনে সুখে থাকবে। তবে তোমাদের বিয়েতে তুমি শার্দূলপুরের রাজা শশাঙ্কবিক্রমকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলো না। তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করবে।

রাজা বললেন, সে যদি না আসে!

তবে তুমি অল্পদিনের মধ্যে ধনুর্দ্দেশ রাজ্য আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করে দেবে। এবং ধনুর্দ্দেশ, রাজ্য জয় করে নেবে।

কিছুদিন পর কাপালিক নিজে উপস্থিত থেকে রাজা শার্দূল বিক্রম এবং রানী চন্দ্রমল্লিকার শুভ বিবাহ কাজ সমাধান করলেন। রাজ্যজোড়া সাতদিন ধরে চলল আনন্দ উৎসব। রাজার বাড়িতে ভালো ভালো ভোজ করে প্রজারা দারুণ খুশি।

বিবাহে ধনুর্দ্দেশের রাজাকে যোগ না দেয়ার অপরাধে এবং রানী চন্দ্রমল্লিকার শত্রু বিনাশের অভিপ্রায়ে রাজা শার্দূল বিক্রমের সৈন্যরা ধনুর্দ্দেশ রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ধনুর্দ্দেশ রাজ্যের রাজা ও শশাঙ্ক বিক্রম পরাজিত ও নিহত হলো।

এরপর রাজা শার্দূল বিক্রম, রানী চন্দ্রমল্লিকা ও রাজপুত্র প্রতাব বিক্রমকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন।

CamScanner

রাজপুত্রের স্বয়ম্বরা সভায় যোগদান

তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। রাজপুত্র প্রতাব বিক্রম বড় হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। প্রতাব বিক্রম এখন বাইশ বছরের পরিপূর্ণ যুবক। দীর্ঘ দেহ। গৌড় বর্ণ। শৌর্যবীর্যে, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। অস্ত্র চালনায় দক্ষ। বর্তমানে সে শার্দূলপুর ও ধনুর্দ্দেশ রাজ্যের রাজা।

রাজাধিরাজ শার্দূল বিক্রম শার্দূলপুর আর ধনুর্দ্দেশ আক্রমণ করে যুদ্ধে দুই রাজ্যের রাজাকে পরাজিত ও হত্যা করার পর এই দুই রাজ্যের সিংহাসনে নিজের বড় পুত্র প্রতাব বিক্রমকে রাজত্ব করতে বসিয়েছিলেন।

অল্প দিনেই প্রতাব বিক্রমের শৌর্যবীর্যের এবং সুশাসনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতাব একজন সুদক্ষ এবং প্রজাহিতৈষী রাজার প্রশংসা পার্শ্ববর্তী রাজ্য গাবতলী পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

এদিকে কাপালিক এখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে। একদিন রাজা শার্দূল বিক্রমকে ডেকে বললেন— রাজকুমারের বিয়ের বয়স হয়েছে তাকে বিয়ে দাও। আমি ধ্যান করে দেখলাম তোমার পার্শ্ববর্তী গাবতলী রাজ্যের রাজকন্যা পুষ্পকুমারি রাজকুমারের যোগ্য পাত্রী। তবে গাবতলী রাজ্যে পয়গাম পাঠানোর আগে কুমারের সঙ্গে রাজকন্যা পুষ্প কুমারির দেখা হওয়া প্রয়োজন। কিছুদিন পর রাজা শার্দূল বিক্রম রাজকুমারকে ডেকে তার বিবাহের কথা এবং বিবাহের পয়গাম পাঠানোর আগে গাবতলী রাজ্যের রাজকন্যাকে দেখে আসার কথা বলেন।

এদিকে রাজকন্যা পুষ্পকুমারী ধনুকভাঙ্গা পণ করেছে নিজের পছন্দ ছাড়া বিবাহ করবে না। কত রাজ্যের রাজকুমাররা আসে আর যায়। কেউ দেখতে সুপুরুষ, কেউ অস্ত্র চালনায় পারদর্শী। কেউ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, কেউ দক্ষ সৈনিক। কিন্তু রাজকন্যার কাউকেই পছন্দ হয় না। কেউ রাজকন্যার মন জয় করতে পারে না।

প্রতিপক্ষকালে রাজা একবার করে রাজকন্যার জন্যে স্বয়ম্বর সভা ডাকেন। সব রাজপুত্ররা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। এদিকে রাজকন্যার বয়স বেড়ে চলে। এ কথা ঘুরেফিরে রাজপুত্র প্রতাব বিক্রমের কানেও এসে পৌঁছে।

প্রতাব বিক্রমের পৌরুষে আঘাত করে রাজকন্যার এই অহংকার। সে পিতা শার্দূল বিক্রম এবং রানী মাতা চন্দ্রমল্লিকার আশির্বাদ নিয়ে রওনা হলেন গাবতলী রাজ্যের উদ্দেশে। রাজকুমার সৈন্য সামন্ত হাতি ঘোড়া কিছুই সঙ্গে নিল না। শুধু তিনজন সুদক্ষ সেনাপতি বন্ধুকে সঙ্গে নিল।

অনেক পথ ঘুরে অনেক ক্রোশ দূরে গাবতলী রাজ্যে অবশেষে কুমার বাহাদুর পৌঁছলেন। গাবতলী রাজ্যের রাজা বল্লববিক্রম রাজকুমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। রাজবাড়িতে তাদের বিশ্রাম আর খানাপিনার আয়োজন করা হলো।

রাজা বল্লব বিক্রম এবং রানী রাজকুমার প্রতাব বিক্রমকে অনেক বিনয়ের সাথে বলতে লাগলেন, বাবা, তোমরা পুণ্ড্রননগর রাজ্য থেকে এসেছ। আমরা খুবই খুশি হয়েছি। আমাদের কন্যা পুষ্পকুমারী রূপে-গুণে সদুর্শনা এবং একেবারে অনন্যা। তার একটাই পণ যে রাজকুমার তার মন জয় করতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। তা না হলে সে চিরদিন চিরকুমারী হয়ে থাকবে। তা বাবা তোমরা তো একই উদ্দেশে এসেছ। আমরা তোমাকে আশির্বাদ করি যেন তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তবে এখন তোমরা বিশ্রাম কর আহারাদি সম্পন্ন কর। সন্ধের পর পুষ্প কুমারীর ঘরে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।

সন্ধের পর আকাশে যখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ উঠল। চারদিক শুদ্র কোমল জ্যোস্নায় ভরে উঠল তখন রাজপুত্র আর তার সহচরদের রাজকন্যা পুষ্পকুমারীর প্রাসাদে নিয়ে আসা হলো। একটা বিরাট সুসজ্জিত কারা। পাশে একটি ঝর্না আর ফুল বাগান। এতো ফুল ফুটেছে তাদের সৌরভে চারদিক মৌ-মৌ করছে।

রাজকুমারী ফুল সজ্জায় সজ্জিত হয়ে রাজকুমারদের সঙ্গে আলাপ করতে বসল। প্রথমেই রাজকুমারদের সুশীলতল সুগন্ধী সরবত খেতে দিয়ে তাদের আমন্ত্রণ করল পুষ্পকুমারী।

রাজকুমারী পুষ্পের রূপ লাবণ্য দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে গেল। আর পুষ্পর হাতের সরবত অমৃতসুধার মতো মনে হলো। সরবত পান করার পর সভায় কথা শুরু করল। কিন্তু রাজকন্যা পুষ্পকুমারী যে এই কুমারের আগমনের জন্যেই অপেক্ষা করছিল তা কুমারকে দেখেই বুঝতে পারল। তাই রাজকুমারের কোনো পরীক্ষা না নিয়ে রাজকন্যা বলল— আমি শৈশবকাল থেকে তোমার শৌর্যবীর্যের প্রশংসা শুনে বড় হয়েছি। এবং এত দীর্ঘ সময় আমি যেন তোমারই পথ চেয়ে বসে ছিলাম।

CamScanner

রাজকুমার এবার একটু কৌশল অবলম্বন করল রাজকুমারীর ভালোবাসাকে পরীক্ষা করার জন্যে। সে অতি বিনয়ের সাথে বলল, রাজকুমারী তুমি অতি সুন্দরী এবং সুলক্ষ্মনা। তুমি অনেক সুযোগ্য রাজকুমার পাবে তোমার স্বামী হিসাবে। এখন আমি তোমার অনুমতি নিয়ে বিদায় হতে চাই। তুমি অনুমতি দিলেই আমি বিদায় হই।

রাজকুমার প্রতাব বিক্রম অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল রাজকুমারীর চেহারা বিষাদে ছেয়ে ধরেছে। রাজকুমারী বলল, কুমার অনুগ্রহ করে আমার সব কথা শোন। তুমি যদি শুনতে না চাও তবে তোমার পায়ে ধরব। তাও যদি তুমি না শোন প্রয়োজন আমার আদেশে তোমাকে বন্দি করে হলেও আমার এ কাহিনী তোমাকে শোনাব।

রাজকুমারীর কথায় এতটুকু ভীত না হয়ে রাজকুমার উত্তর করল তোমার এত সুন্দর মুখে কটুকথা শোভা পায় না। রাজকুমারী তবে তুমিও জেনে রাখ, তোমার দেখান ভয়ে আমি ভীত নই। আমি পঞ্চাশ ষাটজন সৈন্যকে একাই কাবু করতে পারব। আর আমার সঙ্গে আছে অতি বিশবাহু আমার তিন সেনাপতি বন্ধু। একটু ইশারা করলেই তারা হিংস্র সিংহের মতো ঝাপিয়ে পড়বে তোমাদের সৈন্যবাহিনীর ওপর। তার উপর অদূরে গোপনে মোতায়েন আছে পুণ্ড্রননগরের বিশাল সেনাবাহিনীর একটি অংশ। আদেশ পেলে তারা ধ্বংস করে দিবে এই গাবতলী রাজ্য।

নিমিষেই রাজকুমারী উঠে রাজকুমারের পায়ের কাছে বসে পড়ল। মিনতি করে বলল, কুমার মিছেই আমরা বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ছি। আমি তোমারই অপেক্ষায় এ যাবৎকাল অপেক্ষা করেছি।

রাজকুমার রাজকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে কোনো বিদ্বেষ বা ক্রোধ-অবহেলা নেই। এখন রাজকুমার পুষ্পকুমারীকে মাটি থেকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। রাজকুমার বলল, রাজকুমারী, আমিও তোমার রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে আছি। চল আমরা আমাদের বাবা মাকে বিয়ের আয়োজন করতে বলি।

চল কুমার।

রাজা জয়পীর ও কমলা সুন্দরীর উপাখ্যান

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। পুণ্ড্রবর্ধননগরী তখন সুখ ও সমৃদ্ধির নগরী হিসাবে চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই সুখ সমৃদ্ধির কথা শুনে আর দেখে পার্শ্ববর্তী অনেক রাজ্যের রাজা পুণ্ড্রবর্ধননগরের মতো করে নিজ রাজ্য সাজাতে এবং শাসন ব্যবস্থা চালু করে নিজ নিজ রাজ্যকেও সুখ সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করতে চাইত। কোনো কোনো রাজা আবার পুণ্ড্রবর্ধননগরী দখল করে নেয়া যায় কীভাবে তারও চেষ্টা তদবির করত। এই উদ্দেশে কেউ কেউ গোপনে ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধননগরীতে প্রবেশ করত।

কাশ্মির রাজ্যের রাজা জয়পীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বিভিন্ন দেশ দেখে অবশেষে পুণ্ড্রবর্ধনে এসে থেমে গেলেন, পুণ্ড্রবর্ধনের সুখ-সমৃদ্ধি সৌন্দর্য আর শিল্প সংস্কৃতির সমৃদ্ধি দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হলেন।

স্কন্ধমন্দির নামে পুণ্ড্রবর্ধননগরীতে ছিল একটি বিরাট মন্দির। এই মন্দিরে পূজা অর্চনার সাথে সাথে নাচ গান বাজনাবাদ্য হত। এখানে নগরীর অনেক সুন্দরী নর্তকীরা নাচ দেখাত। রাজ-রাজারা বসত নর্তকীদের নাচ-গান দেখতে। পুণ্ড্রনগরের রাজা অন্যদেশের রাজাদের আমন্ত্রণ করত এই নাচ-গান দেখার জন্যে।

যে সব নর্তকীরা নাচ-গান করত তাদের মধ্যে সুন্দরী শ্রেষ্ঠ ছিল কমলা সুন্দরী নামে এক নর্তকী। যেমন ছিল তার রূপ-যৌবন তেমন ছিল সে নাচে-গানে পারদর্শী। মন্দিরে প্রতিদিনই নাচ-গানের আসর বসত কিন্তু সুন্দরী কমলা প্রতি সপ্তাহে মাত্র একদিন নাচ করত।

মন্দিরের বিশাল আঙ্গিনায় তিলধারণের ঠাঁই হত না। আঙ্গিনার একপাশে অনেকগুলো সিংহাসন ও একটি বড় সিংহাসন পাতা হত। বড় সিংহাসনে পুণ্ড্রবর্ধননগরীর রাজাধিরাজ এবং অন্যান্য সিংহাসনে আমন্ত্রিত রাজারাসহ সভাসদ অমাত্যরা বসতেন।

মন্দিরের সব দরজা খোলা থাকত যাতে প্রজারা যে কেউ ইচ্ছে করলে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। সন্ধের পরই রাজনতর্কী সুন্দরী কমলার নৃত্য অনুষ্ঠান শুরু হত। রাজনর্তকী কমলা সুন্দরী এমন দেখতে এত সুন্দরী তার

উপর কারুকার্যময় মখমলের আর মসলিনের কাপড়-চোপড় পড়ত। সোনা রুপা হীরা জহরতে অপরূপ বেশে সাজ করত। দেখে সকলে মুগ্ধ।

কমলা রাতের প্রথম প্রহরে একবার নাচ করত। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর সম্পূর্ণ নতুন সাজে আবার দ্বিতীয় প্রহরে নাচত। এমন করে সারারাত চলত নতর্কীদের নাচ-গান।

একদিন এক কাণ্ড হলো। কমলা সারারাত নাচ-গান করে ক্লান্ত দেহে নিজ ঘরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কমলার এক দাসি এসে বলল, 'একজন ভিনদেশী আপনার সাক্ষাত প্রার্থী'।

কমলা দাসিকে ভর্ৎসনা করে বলল— তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি ক্লান্ত। আর তুমি কি জান না আমি ভিনদেশী কারো সঙ্গে দেখা করি না!

দাসি বলল, আমি তাকে একথা বলেছি কিন্তু এ ভিনদেশী নাছোড়বান্দা এবং আবাধ্য। আমার অনেক নিষেধ সত্ত্বেও সে বাইরে অপেক্ষায় আছে। আমি তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছি, তুমি যদি আপসে না যাও তবে কুমারী কমলার দেহরক্ষীর হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। তখন সে মৃদু হেসে আমাকে বলে, পঞ্চাশজন দেহরক্ষী নিয়ে এলেও আমি তাদের কাবু করে ফেলব। তারও বেশি আনলে না হয় ওদের সাথে লড়ে মৃত্যুবরণ করব তবু কমলার সঙ্গে দেখা না করে আমি এক পা নড়ব না।

কমলা কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করল দাসিকে, আগন্তুক দেখতে কেমন? বৃদ্ধ না যুবক?

দাসি বলল— সে অতি সুদর্শন যুবক মনে হয় তবে শরীরে একটি অতি ময়লা এবং জীর্ণ চাদর দিয়ে ঢাকা।

দাসি কমলাকে পরামর্শ দিল, আপনি একবার তাকে দর্শন দেন।

কমলারও মনে ইচ্ছে হলো এই নাছোড়বান্দা যুবককে দেখতে। কমলা অনুমতি দিল। যুবক কমলার ঘরে প্রবেশ করলে যুবককে বসতে বলে দাসিকে বাইরে পাহারায় থাকতে বলল। যুবক ততক্ষণে তার শরীর থেকে ময়লা আলোয়ঙ্গ খুলে একটা আসনে রেখে আর এক আসনে বসল। যুবকের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে কমলা নরম স্বরে বলল, আপনি কে তা আমি জানি না। তবে আপনার চেহারা ও বসার ভঙ্গিমা দেখে আমি অনুমান করছি আপনি পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রিয়বংশের কোনো সেনাপতি বা রাজপুরুষ । আমার অনুমান কি সঠিক?

'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ কমলা। আমি সুদূর কাশ্মীর রাজ্যের রাজা জয়পীর। তোমাকে আমি সব কথাই বলব আমার। তবে একটা অনুরোধ একথা গোপন রাখবে।

কুমারী কমলা বলল, অত্যন্ত অন্যায় কোনো অনুরোধ করে আমায় পাপিষ্ঠ হতে সহায়তা না করলে আপনার অনুরোধ মঞ্জুর হলো।

'তাহলে শোন, অবশ্য সব কথা না শুনলে তুমি আমাকে বুঝতে পারবে না। আবার ভুলও বুঝতে পার। তাই তোমাকে সব কথা বলা প্রয়োজন। আমি এসেছিলাম পুণ্ড্রবর্ধননগরীকে কী করে জয় করা যায় তার খবরাখবর নিতে। এই রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধির কথা ভারতের চারদিকে প্রচারিত। আমি ছদ্মবেশে এসেছি তবে গুপ্তচর নই আমি। আমি একজন দেশ প্রেমিক। আমার কাশ্মীরকে কীভাবে আরো সমৃদ্ধশালী করা যায় রাতদিন তারই চিন্তা করেছি। কিন্তু পুণ্ড্রবর্ধনে এসে মন্দিরে তোমাকে দেখে তোমার নাচ গান উপভোগ করে তোমার প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি কমলা। এখন তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি এখন আমার সমস্ত ধ্যান জ্ঞান। এসেছিলাম পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যকে জয় করতে এখন আমি তোমাকে জয় করার আশায় পাগল প্রায়। এখন শুধু তুমি ইচ্ছে করলেই কাশ্মীর রাজ্যের রানী হতে পার। আমি এখানো অবিবাহিত।

জয়পীরের কথা শুনে কমলাও মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজা জয়পীর কমলার কাছে এগিয়ে এসে নিজের আঙ্গুল থেকে একটি হীরার আংটি খুলে কমলার আঙ্গুলে পরিয়ে দিতে দিতে বলল, এটা আমার ভালোবাসার ক্ষুদ্র নিদর্শন। আরো কিছুদিন কমলার গৃহে থাকার পর রাজা জয়পীর বলল, এবার আমার রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। কাশ্মির ফিরে গিয়ে রাজ্যের সব ব্যবস্থাপত্র ঠিক করে দিয়ে তোমাকে রানী বানিয়ে নিয়ে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি শেষ করে আমি ফিরে আসব তোমাকে নিতে।

কমলার মন কেঁদে উঠল। জয়পীরকে সে এতই ভালোবেসে ফেলেছে যে ওকে ছাড়া আর একদণ্ড থাকতে পারবে না। কমলা কিছুতেই রাজাকে যেতে দেবে না। অনেক বুঝিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা জয়পীর কমলার কাছ থেকে বিদায় নিল। রাত অন্ধকার। এমন সময় কমলার গৃহের পাশে বিকট হুংকার ভেসে এল। কমলার পিলে চমকে উঠল। জয়পীর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কমলা তাড়াতাড়ি গিয়ে জয়পীরকে ফিরিয়ে আনল ঘরে। বলল— তোমাকে বলা হয়নি প্রাণাধিক। গত একমাসে ধরে পুণ্ড্রবর্ধননগরের আশপাশের গভীর জঙ্গল থেকে এই সিংহটি রোজ রাতে লোকালয়ে এসে মানুষ মেরে খেয়ে ফেলছে। একমাসে সে পনেরটি মানুষ হত্যা করেছে। সিংহটি খুবই বড় আর শক্তিশালী। রাজা ঘোষণা করেছে, যে এই সিংহটি মারতে পারবে, অর্ধেক রাজত্ব দেবে এবং রাজকন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেবে। এই সিংহটিই মনে হয় আমার গৃহের পূর্ব দিকে এসে

উপস্থিত হয়েছে। আমি এর মধ্যে কিছুতেই তোমাকে বের হতে দেবো না। আমি মিনতি করছি, তুমি আর কিছুদিন থেকে সিংহ দূরে সরে গেলে তারপর কাশ্মিরে রওনা দেবে।

রাজা জয়পীর মৃদু হেসে বলল, তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছ। তুমি আমাকে প্রাণাধিক ভালোবাস বুঝতে পাচ্ছি, তবে একথা ঠিক, সুদূর কাশ্মির রাজ্য থেকে এসেছি আমি। এই দীর্ঘপথে কত বন-জঙ্গল পেরুতে হয়েছে। কত সিংহ, বাঘ, ভল্লুক, সাপের সম্মুখে পড়তে হয়েছে। কত বিপদ অতিক্রম করতে হয়েছে। পথে পথে না হলেও দশটা সিংহ, সিংহী বধ করেছি। বাঘ-ভাল্লুক আর সাপ যে কত মেরেছি তার কোনো সংখ্যা গুণিনি। তুমি ভয় করো না প্রিয়তম। আমি এই সিংহীকেও একবার দেখতে চাই। তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি ওকে মেরে ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাশ্মির রওনা হবো।

জয়পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর এগুনোর পর রাজা জয়পীরের তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নজরে পড়ল, একটি প্রকাণ্ড সিংহ একটি মানুষ হত্যা করে তার পাজরের মাংস খাচ্ছে। রাজা বুঝতে পারল পশুটি খুব শক্তিশালী এবং চতুর। রাজা জয়পরীর খোলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে যেতেই খাওয়া ফেলে সিংহটা ঝাপিয়ে পড়ল জয়পীরের উপর বিকট হুংকারে। জয়পীরও তৈরি। একটি বড় পাথরকে আড়াল করে রাজা সরাসরি সিংহের বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দিল। সিংহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাজা তরবারি চালিয়ে সিংহকে মেরে ফেলল। এবার মৃত সিংহের খানিকটা কেশর কেটে এনে কমলার দ্বারে এসে টোকা দিল জয়পীর। দরজা খুলে সিংহের কেশর হাতে জয়পীরকে দেখে কমলা খুশিতে গর্বে জড়িয়ে ধরল জয়পীরকে। কমলা বলল, আমাকে দেখিয়ে নিয়ে আস সিংহীকে। রাজা নিয়ে চলল। সিংহ দেখে কমলা তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। এক্ষুণি পুণ্ড্রবর্ধননগরীর রাজার লোকজন সব চলে আসবে মৃত সিংহ দেখতে। তার আগেই সব কাজ শেষ করে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। কমলা তাড়াতাড়ি তার নিজ আঙ্গুলে পরা জয়পীরের দেয়া হিরার আংটি খুলে মৃত লোকটির আঙ্গুলে পরিয়ে দিল এই কারণে যে কমলার দাসি গোপনে খবর এনেছে যে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা সংবাদ পেয়েছেন যে, কাশ্মির রাজ্যের রাজা জয়পীর ছদ্মবেশে গোপনে পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বের করার জন্যে গুপ্তচর লাগিয়ে দিয়েছেন রাজা। রাজা জয়পীরের আংটি মৃত লোকটির হাতে দেখলে রাজা বুঝবেন সিংহ রাজা জয়পরীকে হত্যা করেছে তবে মরার আগে রাজা জয়পীরও সিংহটিকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

পুণ্ড্রবর্ধননগরীর রাজসভায় লোকজন চলে এল, তারা সিংহ এবং মৃতদেহটিকে রাজ দরবারে নিয়ে গেল। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তর্ক বির্তকের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মৃত দেহটি রাজা জয়পীরের নয়। রাজা জয়পীর জীবিত আছে এবং পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতেই আত্মগোপন করে আছে। এবং এই সিংহটি তিনিই মেরেছেন। রাজার আদেশ ক্ষণবিলম্ব না করে তাকে খুঁজে বের কর।

রাজার লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খোঁজ খোঁজ—খোঁজ।

রাজার গুপ্তচরেরা জয়পরীকে খুঁজে বের করল রাজনতর্কী কমলার ঘর থেকে। তাকে রাজদরবারে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাজা জয়পীর বুঝল, এখন সব খুলে না বললে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। জয়পীর রাজাকে সব খুলে বলল— পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর সুখ সমৃদ্ধির কথা সর্ব ভারতে বিরাজমান। আমি এখানে এসেছি এখানকার সুখ সমৃদ্ধি লাভের উপর এবং কৌশল দেখে গিয়ে নিজের দেশে তা প্রয়োগ করে আমার কাশ্মির রাজ্যের উন্নতি সাধন করব। এখানে এসে আপনাদের রাজনর্তকী কমলার নৃতগীতে মুগ্ধ হয়ে আমি সব কিছু ভুলে যাই। আমি তার আতিথ্য গ্রহণ করি গোপনে। এতে যে অপরাধ হয়েছে তা সবটুকু আমার। রাজনর্তকীর কোনো দোষ নেই। আমিই তাকে অনুরোধ করেছি, নিষেধ করেছি আমার পরিচয় গোপন রাখতে।

রাজা জয়পীরের নির্ভীক চিত্ত এবং সত্যবাদিতা, বীরত্ব দেখে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা বল্লবাদিত্য খুবই মুগ্ধ হলেন। এছাড়া জয়পীর রাজপুত্রের মতোই দেখতে। খুবই সুদর্শন সুপুরুষ। আর রাজা বল্লবাদিত্য ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে এই সিংহকে হত্যা করতে পারবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেবেন। তার সেই প্রতিশ্রুতিতো আছেই। সুতরাং এখন এর সঙ্গেই রাজকন্যার বিবাহ দিতে হবে।

রাজাধিরাজ নিজে সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজা জয়পীরকে মঞ্চে নিয়ে ছোট একটি সিংহাসনে বসালেন। তারপর একে একে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমে রাজমাতার সঙ্গে, রানীর সঙ্গে। রাজকুমার এবং রাজকুমারীদের সঙ্গে রাজন্যবর্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তারপর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে রাজভোজ শুরু হলো, কিন্তু জয়পীর কিছুই খেলো না। তার চেহারায় প্রবল চিন্তার ছাপ। কী করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন। তিনি তো কমলার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কমলাকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন।

পরদিন বিরাট সভা ডাকা হলো। সকল রাজন্যবর্গ উপস্থিত হয়েছেন।

অনেক নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছে। খানাপিনার পর রাজা বল্লবাদিত্য জয়পীরকে বললেন, এবার যে আমার মেয়ে রাজকন্যা চন্দ্রিমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হয়। সকলে জয়ধ্বনী দিয়ে উঠল।

জয়ধ্বনী শেষ হওয়ার পর রাজা জয়পীর উঠে দাঁড়িয়ে খুবই বিনয়ের সঙ্গে রাজাকে বলল, রাজাধিরাজ, আপনি আমাকে যে পুরস্কার দিতে চাচ্ছেন তাতে আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি। পাশাপাশি আমার একটা কথা না বললে আমি বড়ই বিব্রত থাকব।

রাজন্যবর্গ এবং মন্ত্রীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল।

রাজা জয়পীর বলল— আমি বিবাহিত। আমার এক রানী বর্তমান। আমি একথা না বললে পরবর্তীতে রাজকুমারী চন্দ্রিমার মনে অহরহ অশান্তি হবে। আমি তা চাই না।

জয়পীরের মনে আশা ছিল এতে রাজকুমারী বিয়েতে অমত করবে?

কিন্তু রাজকুমারীকে যখন জিজ্ঞেসা করা হলো— রাজকুমারী বলল, 'তিন দিন পর আমি আমার মতামত জানাব'।

এই সংবাদ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কমলার কাছেও এই বার্তা পৌছাল। কমলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বিছানা নিয়েছিল শোকে তাপে। এই সংবাদ শোনার পর সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খাদ্য খেলো এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে রাজকুমারী চন্দ্রিমা নিশ্চয় সতিনের ঘরে বিয়েতে রাজি হবে না। কিন্তু তিন দিন পর রাজকুমারী চন্দ্রিমা, রাজরানীকে বিবাহে তার সম্মতির কথা জানিয়ে দিল।

রাজার ঘোষণায় রাজ্য জুড়ে রাজকন্যার বিবাহের উৎসবের আয়োজনে মেতে উঠল। অঢেল খানাপিনা, অঢেল আনন্দ। গান বাজনার আয়োজন। সাতদিন ধরে রাজপুরিতে নাচ গানের আয়োজন করা হলো এবং সেই অনুষ্ঠানে রাজনর্তকী কমলার নাচ গান করতে হবে। রাজার আদেশ।

এদিকে কমলা তার বিশ্বস্ত দাসিকে দিয়ে জয়পীরের কাছে একটি চিঠি পাঠাল। চিঠিতে লিখল, প্রিয়তম জয়পীর তোমাকে ছাড়া আমার আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। করতোয়ার জলেই আমার শেষ শান্তি লেখা ছিল কে জানতো। তোমার পথের কাঁটা— এই সামান্য নর্তকীকে ভুলে রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে থাক।

এসব পড়ে রাজা জয়পীর আরো অস্থির হয়ে উঠল। জয়পীর মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল।

সেতো এখন রাজ অতিথিশালায় থাকে। রাজ প্রহরীকে গোপনে নিজের কাছে ডেকে বলল, 'দেখ ছদ্মবেশে আমার কিছু অনুচর করতোয়ার জাহাজ ঘাটায় অপর তীরে অবস্থান করছে। আমি একেবারে শূন্যহাতে কপর্দকহীন অবস্থায় রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারি না। যেহেতু আমি নিজেও একজন রাজা। আমার বিয়ে হবে রাজার মতোই জাকজমকপূর্ণভাবে। তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করলে আমি কাজটি করতে পারি। তোমরা অতি গোপনে দু'টি শক্তিশালী তেজী ঘোড়া সন্ধের পর যদি আমাকে এনে দাও। রাত গভীর হলে আমি জাহাজঘাটায় গিয়ে এক ঘোড়া বোঝাই স্বর্ণমুদ্রা, রাজকন্যার বিয়ের উপঢৌকন হিসাবে নিয়ে আসতে পারি। তার থেকে অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের পুরস্কার হিসেবে দিয়ে বাকি স্বর্ণমুদ্রার রাজকন্যার উপঢৌকন হিসেবে রাজাকে দেব। তবেই রাজায় রাজায় বিয়েটা সুশোভন দেখাবে। আর বিয়ের পর আমি রাজকন্যাকে নিয়ে কাশ্মির রাজ্যে গিয়ে একমাস পর যখন ফিরে আসব তখন তোমাদের ও প্রজাদের জন্যে কয়েক হাতি বোঝাই উপঢৌকন ও স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসব। সেখান থেকে তোমার যা খুশি রাখবে বাকি স্বর্ণমুদ্রা আমার আদেশে তোমার নিজ হাতে গরিব প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে।

প্রহরী খুবই প্রলুব্ধ হলো সে বলল, দু'টি ঘোড়া আমার মনে হয় জোগাড় করতে পারব, আমার ছোট ভাই রাজার ঘোড়াশালার প্রধান রক্ষী।

রাজা জয়পীর তার কাছে রেশম কাপড়ের এক পোটিকা স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাই প্রহরীকে দিল। প্রহরী খুশি হয়ে বলল, "আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা দেখছি। কিন্তু খুব সাবধান, একথা যেন কাকপক্ষীও না জানে। মনে রেখ পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর দেয়ালেরও কান আছে।

জয়পীর বিশ্বস্ত অনুচর থেকে খবর পেয়েছে নাচের অনুষ্ঠানে আসার আগে কমলা করতোয়ার জাহাজঘাটায় স্নান করতে আসবে। স্নানের ছলে সে করোতোয়ার জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে সেটা বুঝতে পেরে জয়পীরের অস্থিরতা বাড়তে থাকে।

নির্দিষ্ট দিনে দুইটি তেজী দ্রুতগামী ঘোড়া রাত্রির প্রথম প্রহরে রাজ বাড়িতে বিয়ের ধুমে সবাই যখন ব্যস্ত তখন জয়পীর রাজ অতিথি ভবনের সব কাপড় চোপড় দিয়ে একটা বড় পোটকা বাঁধল পোটকাটা একটি ঘোড়ায় চড়ালো অন্য ঘোড়ায় নিজে একজন মহাজনের ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘোড়া চালিয়ে জাহাজঘাটার দিকে রওনা দিল। কেউ রাজা জয়পরীকে চিনতে পারল না। যারা দেখল তারা ভাবল কোনো বণিক তার সামান নিয়ে বাণিজ্য করতে যাচ্ছে। জয়পীর জাহাজ ঘাটার একটু দূরে ঘোড়া রেখে

CamScanner

নদীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করতে থাকলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কমলা দাসিদের সাথে স্নান ঘাটে এসে উপস্থিত হলো। জয়পীর দেখে কমলা একটি বড় পেতলের কলসি গলায় বেঁধে পানিতে ঝাঁপ দিল।

রাজা জয়পীর প্রায় সাথে সাথে করতোয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব সাঁতার দিয়ে কমলার কাছে পৌঁছে ডুবে যাওয়া দেহকে টেনে ধরে সাঁতার শুরু করল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে যেখানে ঘোড়া বাঁধা ছিল সেখানে গিয়ে উঠল। ডাঙ্গায় উঠে কিছুটা সুস্থ হলে রাজা জয়পীর বলল, কমলা, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়। যে করেই হোক তোমায় রক্ষা করে রাজার হাত থেকে বেঁচে কাশ্মির রাজ্যের রানী হিসাবে রাজ সিংহাসনে বসাব তোমাকে এই আমার স্বপ্ন ধ্যান সব জেনেশুনে তুমি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছ দেখে আমি খুবই মনকষ্ট পেলাম এই ভেবে যে আমার উপর তোমার আস্থা নেই'।

কমলা জয়পীরের পা চেপে ধরে বলল, 'তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকার কথা আমি চিন্তাই করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা কর। আমি বুদ্ধিহীনা সামান্য নর্তকী। ক্ষমা কর প্রিয়। তোমার জন্যে মরতে গিয়েছিলাম সেই তুমি আমাকে বাঁচালে! এখন থেকে তুমি যা বলবে সেই মতো চলব আমি'।

জয়পীর বলল, 'তাড়াতাড়ি তোমার ভেজা পোশাক বদলে নাও। আমার কাছে কিছু শুকনা কাপড় আছে তবে সেগুলো পুরুষের পোশাক। একদিকে ভালোই হলো। আমাদের দুজনকেই এ রাজ্য থেকে বেরোতে গেলে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে। আমরা দুজনে বণিক সেজে এ রাজ্য থেকে বের হব। এবং এই রাতের মধ্যেই এ রাজ্য ছেড়ে বের হতে হবে আমাদের। তুমি কি দ্রুত ঘোড়া চালাতে পারবে'?

— 'পারব। পারতে আমাকে হবেই। চল'।

দু'জনে ঘোড়া চালিয়ে কাশ্মির রাজ্যের উদ্দেশে চলল।

অনেক জঙ্গল অনেক পথ পেরিয়ে পথে কোনো বিপদ হলো না। সাতদিন সাতরাত পর রাজা জয়পীর ও কমলা সুন্দরী কাশ্মির রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাল।

দীর্ঘ ছয় মাস পর রাজার সভাসদ এবং প্রজারা তাদের রাজাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উৎসব করা শুরু করল এবং মহা ধুমধামের সাথে রাজা জয়পীরের সাথে কমলা সুন্দরীর বিয়ে হয়ে গেলে কমলা সুন্দরী কাশ্মির রাজ্যের রানী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করল। রাজা জয়পরীর এবং রানী কমলার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাশ্মির রাজ্যকে সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে তোলার কাজে লেগে গেল দু'জনে।

বেহুলার বাসর ঘরের নির্মাণ কাঠামোর সাথে আমার কাছে কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারের মতো মনে হয়েছে। তাই মনে হয় ময়নামতির বৌদ্ধ বিহারের নির্মাণ সময়ে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করার কারণে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ স্থাপনা দেখা যায়, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপাসনালয় হিসেবে। আমার ধারণা বেহুলার বাসর ঘর নয়, শত-শত বছর ধরে যে স্থাপনাকে দর্শকেরা বেহুলার বাসর ঘর হিসেবে মনে করে আসছেন সে স্থাপনা বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের উপাসনালয় বা ধ্যানশ্রম ছাড়া কিছু নয়।

সে যাই হোক, বেহুলার বাসর ঘর নামের যে স্থাপনাটি তাকে ঘিরে যে কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে তা দারুণভাবে শ্রোতাকে আকর্ষণ করে।

বেহুলার বাসর ঘরে যে নরকঙ্কালটি পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩৪—৩৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব খননের সময়। যদি ধরে নেই যে নরকঙ্কালটি লক্ষিন্দরের। সেখানে যুক্তি এসে সাড়া হয় যে, বেহুলা লক্ষিন্দর বাসর ঘর হতে যদি বের হতে না পেরে থাকে তবে দু'টি নরকংকাল থাকার কথা সেখানে একটি বেহুলার অন্যটি লক্ষিন্দরের। কিন্তু নরকংকাল পাওয়া গিয়েছিল ১টি। সুতরাং অনেক গল্পকারের ধারণা যে নরকংকালটি ছিল সেই কাপালিকের। এ ধারণাটি উড়িয়ে দেয়া যায় না। লক্ষিন্দরের পিতার নাম ছিল চাঁন্দ সওদাগর আর মাতার নাম সুনুফা রানী। মহাস্থানগড় থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বেহুলার বাসরঘর থেকে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে চম্পাই সাগর, বর্তমানে যে স্থানের নাম চাঁদমুহা গ্রাম, তার পশ্চিম পার্শ্বে চাঁন্দ সওদাগরের বাস ভবনের ধ্বংসাবশেষ আজো এই কাহিনীর জন্ম সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

CamScanner

বেহুলা লক্ষ্মিন্দর

বেহুলার গল্প বলার আগে আমরা নাগমাতা-নাগকন্যা বা পদ্মদেবী সম্বন্ধে জানি। পদ্মদেবীর গল্পটিও অতি চমৎকার এবং হিন্দুপুরাণ শাস্ত্রের অনুসারী। মনসা মঙ্গলেরই গদ্যরূপ বেহুলার কাহিনী।

হিন্দুদের এক দেবতার নাম শিব। এ অনেক বড় দেবতা। দেবতাকুলের শিরোমণি। সকল দেবতার দেবতা, দেবালোকে অর্থাৎ স্বর্গে তার বাসস্থান। এই দেবতার পরম ভক্ত চম্পাই নগরের এক ধনী বণিক অর্থাৎ ব্যবসায়ি চাঁন্দ সওদারগর। চাঁন্দ্রসওদাগর পরম ভক্তিভরে শিবের পূজা করে। শিবের ধ্যান করে। ভক্তের পরম ভক্তি আর পূজায় খুশি হয়ে শিব চাঁন্দ সওদাগরকে বর দিল অর্থাৎ পুরস্কার দিল হেমতালের লাঠি। এই গাছ দেখতে অনেকটা আখ গাছের মতো কিন্তু সাল গাছের মতো শক্ত আর গন্ধযুক্ত। হেমতালের এমনি একটি গুণ আছে যে এই গন্ধে কোনো সাপ কাছে আসতে পারে না।

শিব তার শিষ্য চাঁন্দ সওদাগরকে আরো দুটো বর দিয়েছিল তার একটি মহাজ্ঞানের অধিকারী করেছিল যার ফলে চাঁন্দ সওদাগর সাপে কাটা রোগীকে ভালো করতে পারত।

তার উপরে ওঝা ধন্বন্তরী নামক এক লোক তার বন্ধু ছিল। এই লোক সাপেকাটা রোগীকে জীবিত করার ওঝা, আর পদ্মদেবী বা মনসাদেবী ছিল দেবতা শিবের কন্যা।

পদ্মদেবীর জন্ম হয়েছে পাতালপুরিতে বাসুকির ঘরে। জন্মের পর থেকে বাসুকি তাকে লালন-পালন করে। ধীরে ধীরে পদ্ম বড় হয়ে ওঠে। বয়োপ্রাপ্ত হলে একদিন পদ্ম বাসুকির কাছে জানতে চায়— আমার পিতা কে?

বাসুকি মেয়েকে আদর করে বলল, তোমার পিতা সকল দেবতার দেবতা, দেবশ্রেষ্ঠ শিব।

'মা আমার পিতা কোথায় থাকেন'।

'তোমার পিতা স্বর্গে দেবালয়ে থাকে'।

'দেবালয়ে আমি পিতাকে দেখতে যাব'।

'যাবে মা, তুমি এখন বড় হয়েছ, রূপে গুণে অনন্যা হয়েছ, সামনে তোমার বিবাহের কথা চিন্তা করেছি আমি। বিবাহের আগে তুমি পিতার সঙ্গে দেখা করে আস একবার। তোমাদের পিতা কন্যার দেখা হওয়া প্রয়োজন । মার আশির্বাদ নিয়ে পদ্মদেবী বা মনসাদেবী স্বর্গে চলল পিতার সঙ্গে দেখা করতে। পিতা শিব নিজের কন্যাকে দেখে খুব-ই খুশি হলো। কন্যাকে অনেক আদর যত্ন করল। কন্যা পদ্মদেবী বা মনসাদেবী দেবালোকে পিতার এত সৌরভ গৌরব পূজা ভক্তি ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হলো। সে মনে মনে ভাবল, পিতার মতো সেওতো পূজা-ভক্তি পেতে পারে। পিতা যেমন স্বর্গে বাস করে জন্য স্বর্গের দেবতাদের পূজা পায় আমি মর্তলোকে বাস করি। আমি মর্তের মনুষ্যকুলের পূজা পেতে পারি। পদ্ম তার ইচ্ছার কথা পিতাকে জানাল। পিতা শিব বলল, কন্যা, এটা তোমার অতি উত্তম প্রস্তাব কিন্তু সমস্যা আছে মর্তলোকের মানুষের পূজা পেতে তোমার।

'কী সমস্যা পিতা'?

'মর্তলোকে আমার এক ভক্ত আছে নাম চাঁন্দ সওদাগর সে যদি তোমার পূজা করে তবেই তুমি মর্তে তোমার পূজা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে নচেত নয়'।

'তুমি আমাকে আশির্বাদ কর পিতা, আমি চাঁন্দ সওদাগরের পূজা আদায় করব'।

'আশির্বাদ করি কন্যা, কিন্তু এটা বড় শক্ত কাজ হবে তোমার জন্যে। চাঁন্দ সওদাগর বড় একরোখা মানুষ'।

'আমিও তোমার কন্যা' নাগ শিরোমণি-মনসা, আমিও যা চাই তাই হতে হবে'।

'জয় হোক মা তোমার'।

পিতার আশির্বাদ নিয়ে পদ্ম বিদায় নিল স্বর্গ থেকে।

২

মর্তলোকে ফিরে এসে পদ্মদেবী বা মনসাদেবী নিজের ইচ্ছের কথা চাঁন্দ সওদাগরকে জানাল। চাঁদ একে তো মনসা বিদ্বেষী, তাতে আবার ওঝা ধন্বন্তরী তার বন্ধু। নিজেও শিবের কাছ থেকে মহাজ্ঞান শক্তি লাভ করেছে যা দিয়ে সাপে কাটা রোগীকে ভালো করতে পারে। সুতরাং, চাঁদ কিছুতেই মনসার পূজা দিতে রাজি হলো না।

কিন্তু মনসার যে চাঁন্দ সওদাগরের পুজো না হলে চলবে না। মর্তলোকে মানুষের মধ্যে মনসা পূজা চালু করতে পারবে না। মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে নিল। ওঝা ধন্বন্তরীকে বংশ ধ্বংস করল।

চাঁন্দ সওদাগরের সাত পুত্র ত্রিলোচন, দিগম্বর, হরিহর, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস, গুণকর এবং সপ্তম ও শেষ পুত্রের নাম লক্ষ্মিন্দর।

সওদাগর অতি দৃঢ় চিত্তের মানুষ। সে জানত যার জন্মের পরিচয় নেই সে কখনও দেবী হতে পারে না এবং সে পূজাও পাওয়ার যোগ্য নয়।

পদ্মর অনুরোধের প্রতি উত্তরে সে পদ্মকে যা বলেছিল তা পদ্মপুরানে আছে—

যে হাতে পূজিছি আমি দেব শূল পাণি
সে হাতে পূজিব আমি বেঙ খাকি কানি?

চাঁন্দ সওদাগর দৃঢ় ভাবে জানিয়ে দিল, তোমাকে পূজা অসম্ভব! শুধু তাই নয়, হেমতালের লাঠি দিয়ে পদ্মকে তাড়িয়ে দিল তার বাড়ি থেকে। পদ্মদেবী অগ্নিশর্মা হয়ে ফিরে গেল নিজ বাড়িতে। মনসাদেবীর পুজো না দেয়া পর্যন্ত কী করে চাঁন্দ সওদাগরের ক্ষতি করা যায়। কী করে তাকে বাধ্য করা যায়, মনসাদেবীর পুজো দিতে, সেই চেষ্টা করতে থাকল মনসাদেবী বা পদ্মদেবী।

মনসাদেবী একে একে চাঁন্দ সওদাগরের ছয় পুত্রকে হত্যা করল। তার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দিল তবু চাঁদকে তার প্রতিজ্ঞা থেকে একচুল নড়াতে পারল না। সকল পুত্রকে হারিয়ে সওদাগরের স্ত্রী সনুকা চোখের জলে ভাসে। সারা দিন রাত কাঁদে আর স্বামীকে অনুরোধ করে মনসার পুজো দিতে কিন্তু চাঁন্দ সওদাগর কঠোর। কোনো ভাবেই সে 'ব্যাঙক খাকী' কানির পুজো করবে না।

কিন্তু স্ত্রীর চোখের জল আর বিলাপে টিকতে না পেরে একদিন দূর দেশে বাণিজ্যে বের হওয়ার চিন্তা করল। সমাই পণ্ডিতকে ডেকে ভালো দিন দেখে মধুকর নামের চৌদ্দডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্যের জন্য সিংহল অর্থাৎ বর্তমানের শ্রীলঙ্কা যাত্রা করল।

সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যথা সময়ে একদিন সওদাগরের চৌদ্দডিঙ্গা সিংহলদ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। চাঁন্দ সওদাগর সিংহল দ্বীপের রাজার জন্যে বঙ্গদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিল ডিঙ্গা বোঝাই নারিকেল। রাজাকে নারিকেল উপহার দিল এবং এর সুস্বাদু পানি পান করতে বলল। রাজা বন্ধুর অনুরোধে নারিকেলের পানি পান করতে উদ্যত হলে পদ্মদেবী সেখানে

উপস্থিত হয়ে এই ফলের পানিতে বিষ মেশানো আছে। এই ফলে পানি পান করলে রাজা মারা যাবে বলে ভয় দেখাল। রাজা ভীত হয়ে পানি পান না করে এবং এ পানি বিষাক্ত কি না এবং খেলে মানুষ মারা যায় কি না পরীক্ষা করার জন্যে তার এক দাসকে পানি পান করতে আদেশ করল। দাসের নাম ছিল তিনকড়িয়া। এই দাসকে রাজা তিন কড়ি দিয়ে কিনেছিলেন। তাই রাজা তার নাম দিয়েছেন তিনকড়িয়া। প্রাণ ভয় কার নেই। সে ক্রীতদাস হলে কী হবে। তারও তো প্রাণ ভয় আছে। কিন্তু রাজার আদেশ মানতে সে বাধ্য। সে প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নারিকেলের সুমিষ্ট পানি পান করল। রাজা, সভাসদ সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে তাকিয়ে রইল। রাজা যখন দেখলেন ক্রীতদাস তিনকড়িয়া বেঁচে আছে। মরল না বরং সে অতি আগ্রহ করে আরো নারিকেলের পানি খেতে চাইল তখন রাজা খুব খুশি হলেন এবং চাঁন্দ সওদাগরকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়ে তার সমস্ত উপঢৌকন গ্রহণ করলেন এবং নিজেও পানি পান করলেন। তার সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা করলেন।

এভাবে ছয় মাস বাণিজ্য করে বহু পণ্য বোঝাই করে চাঁন্দ সওদাগর দেশের উদ্দেশে রওনা দিল। পথে পদ্মদেবী অনেক বিপদে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কিন্তু রাজার চৌদ্দডিঙ্গা যখন কালীদহ সাগরে এসে পৌঁছাল তখন পড়ল আর এক মহাবিপদে। মহাস্থানগড় থেকে চার কিলোমিটার পূর্বে কালীদহ সাগর। এর পানি বিষে নীল। তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ বিষাক্ত সাপ দিনরাত বিষ ঢালে এই সাগরে। সওদাগরের চৌদ্দডিঙ্গা যখন কালিদহ সাগরে পৌঁছাল পদ্মদেবী তখন সেই সাগরে তুলল এক মহাতুফান। ঝড়ের কবলে পড়ে—

কালীদাহে পড়ে চাঁদ পাণ করে জল
ক্ষণকাল যায় ভেসে ক্ষণে হয় তল।
সপ্তদিন নব রাত্রি ভাসিল সাগরে
ইচা মাছ বাসা বাঁধে দাঁড়ির ভেতরে।
দ্বিজরাধা নাথ বলে ভাবি পদ্মবর্তী
না জানি চাঁদের কত রয়েছে দুর্গতি।

কালীদহ সাগরে পড়ে অনেক পানি খেয়ে টেয়ে চাঁন্দ সওদাগর কোনো মতে বেঁচে উঠলো। কিন্তু তার চৌদ্দ ডিঙ্গার সব মালপত্র সাগরে ডুবে গেল। রাজা শূন্য হাতে ঘরে ফিরে এল।

রানী সুনুকা সব সময়ই স্বামীকে মনসার সঙ্গে বিরোধ না করে পুজো দিতে অনুনয় বিনয় করে কিন্তু রাজার কঠোর প্রতিজ্ঞা ধন প্রাণ সব গেলেও মনসার পুজো কখনো নয়। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে সওদাগর বলল,

দুঃখ পেয়েছি আমি, তুমিও প্রচুর
বিধির কৃপায় সব হয়ে যাবে দূর।

সওদাগর স্ত্রীকে আরো বলল, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি কানি ব্যাঙ খাগি যদি আর কখনো আমার বাড়ির ধারে কাছে আসে তবে এমন শিক্ষা দেব চিরকাল মনে থাকবে তার।

এমনি করে দিন চলে যায়। সুনুকার মনে অনেক কষ্ট ছয় পুত্রকে হারিয়ে। ছয়টি জোয়ান পুত্র তার মনসার কোপ দৃষ্টিতে পড়ে হারাতে হলো। এদিকে সওদাগরকেও কথা শোনাতে পারছে না। কী করবে সুনুকা। মনের দুঃখে দিন গুজরান করে।

এর কিছু দিন পর সওদাগরের সপ্তম পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। চাঁদের মতো ফুটফুটে শিশু। শিশুর মুখ দেখে সওদাগর আর সুনুকার মনে আনন্দ ধরে না। সাথে সাথে মানুকার মনে ভয়, কখন এই শেষ পুত্রকেও মনসা গ্রাস করে।

শিশুর নাম রাখা হলো লক্ষিন্দর।

ধীরে ধীরে লক্ষিন্দর বড় হয়ে উঠল। সওদাগর স্ত্রীকে যাই বলুক মনে মনে ভয় কখন মনসা কানীর কুনজরে পড়ে!

দেখতে দেখতে লক্ষিন্দর যৌবনপ্রাপ্ত হলো।

সওদাগর স্ত্রী সনুকা জীবিত একমাত্র পুত্রের বিয়ের জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগল স্বামীর কাছে। স্বামী চাঁন্দ সওদারের মনে ভয় লক্ষিন্দরের জন্মের পর পুরোহিত লক্ষিন্দরের ভাগ্য গনাবাছা করে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, 'বাসর রাতে লক্ষিন্দর সর্প দংশনে মারা যাবে'। এই ভবিষ্যত বাণী যদি সত্যি হয় তবে শেষ বয়েসে এই শেষ পুত্রকেও হারাতে হয়।

অনেক চিন্তা ভাবনার পরে এবং অন্যান্য গণকদিগকে দিয়ে গণাবাছা করে স্ত্রীর কান্নাকাটি পিড়াপিড়িতে লক্ষিন্দরের বিয়ে দিতে রাজি হলো।

লক্ষিন্দরের উপযুক্ত কন্যা খোঁজার জন্যে ভাট নামের এক ঘটককে ডাকা হলো। ভাট তার পুথিপুঁজি খুঁজে পাত্রীদের বর্ণনা করতে লাগলো–

ভটে বলে নরপতি কর বাক্য অবগতি
কহি শোনা সভার গোচরে।

ভ্রমি আমি সর্বদেশ তত্ত্ব জানি সর্বশেষ
জানি কন্যা আছে যার ঘরে।
ভবানী নগরে রাম চন্দ্রকান্ত রাজ নাম
তার কন্যা নাম পদ্মাবতী
চাঁদ বলে, "রাম রাম" লইলে কানির নাম
এই ছুলে যায় কুল জাতি।
মণিপুরে নরবর চন্দ্রকেতু গুণধর
তার কন্যা চণ্ডিকা ভবানী
চাঁদ বলে কার্য নাই অন্য কথা কহ ভাই।
এই কন্যা গুরুতুল্লা মানি।
বিজয়নগরে ঘর বিদ্যাধন নরধর
তার কন্যা পদ্মামণি নাম
চাঁদ বলে কুলেশীলে আমার সমান হলে
সে পাষণ্ড কানির গোলাম।
পূর্বেতে উদয়গিরি নরসিংহ অধিকারী
স্বর্ণরেখা কন্যা তার ঘরে।
চাঁদ বলে মুক্ত নয় মাতৃনামা কন্যা হয়।
বিধি নহে শাস্ত্র অনুসারে।
উজানির নরপতি মুক্তিশ্বর মহামতি
তার কন্যা বেহুলা সুন্দরী
হয় কন্যা অতি সতী ঈশ্বরেতে সদামতি
রূপে গুণে বিদ্যাধরী।
আর একঅদভূমি শোন চাঁদ মহামতি
লোহা অন্ন পারে রাধিবার।
দ্বিজ রাধানাথ বলে এ কন্যার বিয়া হলে
ধনে জনে হইবে উদ্ধার।

ভাটের শেষ কন্যার বর্ণনা শুনে চাঁদ সওদাগর খুশি হলো। খুশি হলো সভাসদ ও সুনাকা সুন্দরী। যথা নিয়মে ঘটক পাঠানো হলো কিন্তু বেহুলার পিতা মুক্তেশ্বর এ সম্বন্ধে রাজি হলো না। কিছুতেই না। ঘটককে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল—

পদ্মা তুচ্ছ নয়
দেবতা হিংসিলে হবে স্ববংশতে ক্ষয়।
ঈশ্বর নন্দিনী পদ্ম খ্যাত চরাচর
দেবতা গন্ধর্ব যার ভয়েতে কাতর।
নিংশ করিল নাগে ছয় পুত্র খেয়ে
কিসের গৌরব করে এক পুত্র লয়ে?
ছয় পুত্রবধূ আছে বিধবা সাজিয়া
আবার সে বধূ খোঁজে কোনো মুখ নিয়া?

মুক্তেশ্বরের কথায় ও ব্যবহারে ঘটক মলিন বদনে নিয়ে এল চম্পক নগরে চাঁদ সওদাগরের কাছে। বেহুলার পিতার নাম মুক্তেশ্বর ওরফে বাসু বানিয়া। মাতার নাম কমলাদেবী। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ভাবতে থাকে চাঁদ সওদাগর শেষমেশ বানিয়ার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে চেয়েও ব্যর্থ হলো। বিধাতা এতই রুষ্ট তার ওপর। লজ্জায় হৃদয় তার ভেঙে খান খান হতে থাকে। ঘরে ছয় ছয়টা বিধবা পুত্রবধূ। পুত্রদের শোক, স্ত্রীর বিলাপ চাঁন্দ সওদাগর অধীর হয়ে উঠল। মনসাদেবীকে খুন করতে পারলে তার হৃদয় জ্বালা জুড়ত। পদ্ম এখানেও কুটকৌশল অবলম্বন করল। সে বেহুলা সুন্দরীকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখাল যেন স্বর্গের কোনো দেবী এসে বেহুলাকে বলছে তুমি যদি লক্ষিন্দরকে বিবাহ কর তাহলে আমাকে পাবে।

ভোরে বেহুলা তার পিতা মুক্তেশ্বরকে স্বপ্নের কথা খুলে বলল। কন্যার কথাগুনো মুক্তেশ্বর অনেক ভেবে চিন্তে কন্যাদানে রাজি হলো। পদ্মদেবী অর্থাৎ মনসাদেবী এবার এসে চাঁন্দ সওদাগরকে বলল, তুমি মুক্তেশ্বরের কাছে আবার বিয়ের পয়গাম পাঠাও। এবার কন্যাদানে মুক্তেশ্বর রাজি হবে। আমি অনেক বলে কয়ে তাকে রাজি করিয়েছি। আর একটা কথা। এবার থেকে তুমি আমার পুজো দেবে যদি না দাও তবে বাসর রাতে তোমার এই শেষ সন্তানকে সর্প দংশনে হত্যা করব।

পদ্মার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা শুনে রাগে আগুন হয়ে হেমতালের লাঠি নিয়ে ছুটে আসল। পদ্মকে এমন ঠেঙ্গানী দিল যে বাড়ির চোটে পদ্মর কোমর ভেঙে গেল। পদ্ম ছুটে পালাল চাঁন্দ সওদাগরের বাড়ি থেকে কিন্তু যেতে যেতে বলে গেল, তোর বংশ নির্বংশ করে ফেলব। তোর একমাত্র ছেলেকে খেয়ে ফেলব।

দিন যায় চাঁন্দ সওদাগর ভেবে পায় না কী করবে এখন। কী করে তার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র লক্ষিন্দরকে বাঁচাবে ঐ কালনাগিনীর হাত থেকে।

সে যেন অসহায় হয়ে গেছে। চার দিক থেকে তার বিপদ। পদ্ম তার পিতা শিবের কাছে কৌশলে কেঁদে কেটে চাঁন্দ সওদাগরের মহাজ্ঞান শক্তি কেড়ে নিয়েছে। তার বন্ধু ওঝা ধন্বন্তরী সর্প দংশনে মারা গেছে। এটাও ঐ পদ্মর কাজ। এখন পদ্মর হাত থেকে কী করে বাঁচে ! মহাচিন্তা, বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছে। এমন সময় স্ত্রী সুনুকা এসে দাঁড়াল সওদাগরের পাশে। কেঁদে কেটে আকুল হয়ে স্বামীকে বলল, 'তোমাকে কত আর বোঝাব? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাদের বংশের একমাত্র প্রদীপ লক্ষিন্দরের জন্যে হলেও পদ্মকে পুজো দাও। আমার ছেলেকে বাঁচাও।

নিরীহ অসহায় চাঁদ সওদাগর তবু নির্ভীক চিত্তে স্ত্রীকে বোঝাল, তুমি ভয় পেও না রানী। এবার আমি এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেখানে কানির কোনো ক্ষমতাই থাকবে না। ঐ কানি আমাদের আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ধীরে ধীরে বিবাহের দিন ঘনিয়ে এল। চাঁন্দ সওদাগর বেহুলার পিতা বানিয়ার সঙ্গে মিলে পরামর্শ করে বেহুলা লক্ষিন্দরের জন্য একটি লোহার বাসর ঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নিল। শত তাড়াতাড়ি বিশ্বকর্মাকে সংবাদ দেয়া হলো। বিশ্বকর্মার নাম বিনোদ। চাঁন্দ সওদাগর বিনোদকে আদেশ দিল এমন একটি লোহার বাসর ঘর বানাবি কোনো দরজা-জানালা তো থাকবেই না এমনকি একটা ফুটোও থাকবে না যেন একটা মশাও না ঢুকতে পারে।

বিশ্বকর্মা চাঁন্দ সওদাগরের আদেশ পেয়ে তার লোক লস্কর লাগিয়ে দিল কাজে। একরাতে বাসর ঘর তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। শতশত লোক সারা রাত কাজ করে ঘর বানিয়ে শেষ করল। চাঁন্দ সওদাগর লোহার বাসর ঘরে কোনো ছিদ্র আছে কিনা পরোখ করার জন্যে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ধোয়া করল। দেখল— কোনো দিক দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে না। খুশি হলো চাঁন্দ সওদারগর। বিশ্বকর্মাকে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে বিদেয় করল।

বিশ্বকর্মা মহাখুশি এত টাকা পয়সা পেয়ে। সে খুশিতে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরছে আর ভাবছে, এবার সে পদ্মকে বিয়ে করবে। এমন সময় পথ আগলে দাঁড়ালো পদ্মের নাগ সৈন্যসহ পদ্ম। পদ্মদেবী চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলল, ওহে পাষণ্ড কর্মকার! তোর এতবড় সাহস! তুই আমার কাজের বিরোধিতা করিস। এবার মজা দেখ! এই কথা বলে সৈন্যরা তাকে ঘিরে ধরল। সব সাপ তার সারা শরীর প্যাঁচিয়ে ধরল।

পদ্মার বচন শুনে উড়িল পরান খানি
বলে দেবী রক্ষা কর মোরে।
করি সত্য অঙ্গীকার গৃহে কাটি দিবদ্বার
প্রবেশ করিতে নাগ পারে।

শুধু তাই নয় বিশ্বকর্মার কাছ থেকে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়ে পদ্ম নাগ সৈন্যদের নিয়ে চলে—

নাগ সৈন্য লয়ে পদ্ম চলে গেলে ঘর,
ভয় পেয়ে কামারের গায়ে ওটে জ্বর।
অন্নজল না খাইয়া করিল শয়ন,
চমকি চমকি ওঠে দেখিয়া স্বপন।
মহাকষ্টে কাল রাত্রি প্রভাত হইল,
অস্ত্র লয়ে কর্মকার বাসরেতে গেল।
ধীরে ধীরে দুই ছিদ্র রাখিল কাটিয়া,
আচ্ছাদন দিল তাতে হরিতাল দিয়া।
শব্দ শুনে সওদাগর চলিল ধাইয়া,
মহাক্রোধে কামাররে সে বলে ডাক দিয়া,
করিলে ঘরের কার্য লোকের বিদিত,
তবে আসি দ্বার কাট এ কোন উচিত।
আমারে না চেন বেটা-পাপী-কামারিয়া,
শুলে চড়াইব তোরে রাজপথে নিয়া
কর্মকার বলে সাধু ক্রোধ অনুচিত,
কেমনে বুঝিলে তুমি হিতে বিপরীত,
অল্প কিছু ভগ্ন ছিল ঈষানের কোণে,
অকস্মাৎ সেই কথা পড়ে গেল মনে।
নিঃসন্দেহ করিলাম এখন আসিয়া,
তুমি মোরে মন্দ বল মর্ম না বুঝিয়া
তাহা শুনি চন্দ্রধর সন্তুষ্ট হইল,
এক জোড়া পট্ট বস্ত্র কামারে দিল।
তুষ্ট হয়ে নিজ গৃহে গেল কর্মকার
স্নান করে পেটভরে করিল আহার।
তারপর গৃহিণীকে কহিল সে যাও,
কাল থেকে ঘুম নাই বিছানা বিছাও।

যা হোক আরো নানা ঘটনা ঘটার পর বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশ তিথিতে মহা ধুমধাম করে বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হলো, বিবাহের পর বর বধূকে বাসর ঘরে আনা হলো। পদ্মদেবীর প্রতিজ্ঞা বানচাল করার জন্যে চাঁন্দ সওদাগর বাসর ঘরটির বাইরে নানা ভাবে পাহারা বসিয়ে ঘরটি আরো সুরক্ষার ব্যবস্থা করল। অন্যদিকে পদ্মদেবী তার কার্য উদ্ধারের জন্য আরো দৃঢ় ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে লেগে গেল। সে তার নাগ সৈন্যদের ডেকে ঘোষণা করল, কে আজ এই রাতে আমার হুকুম তামিল করতে পারে? ঘোষণা শুনে একটি এনি সাপ মাথা উঁচু করে বলল, মা আমি পারব।

খুশি হয়ে দেবী তখন তার গলায় রাখা আড়াই তোলা বিষ থেকে এক তোলা কালকূট বিষ দিল ছেলেকে এবং কীভাবে কামড়াবে লক্ষিন্দরকে এবং কীভাবে বাসর ঘরে প্রবেশ করবে তার জানা কৌশল শিখিয়ে দিয়ে ছেলেকে বিদায় দিল। এনি সাপ দ্রুত গতিতে ছুটে চলল। মাঝপথে এসে দেখে পথের পাশে নালায় একটি দারকি বসান আছে। তার মধ্যে নানা রঙের ছোট ছোট মাছ কিলবিল করছে। মাছ দেখে এনির ভারী লোভ হলো। সে ভাবল, রাত তো অনেক বাকি আছে, দু-একটা মাছ ধরে খেয়ে গেলে আর অসুবিধা কী? এই ভেবে সে তার মুখের কালকূট বিষ গোবরের উপর রেখে মাছ ধরার কাজে গেল। সে দারকির ভেতর ঢুকে মনের আনন্দে স্বাদের মাছ খেতে শুরু করল। এত মাছ খেল যে তার পেট ফুলে কলাগাছের মতো হয়ে উঠল। মাছ খাওয়া শেষ হলে তার মায়ের আদেশের কথা মনে পড়ল। সে দারকি থেকে বের হতে গেল। কিন্তু তার মোটা পেট নিয়ে আর দারকির ঘোরপ্যাচ থেকে বের হতে পারে না। ও প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে বের হতে। রাত ভোর হয়ে গেল। এমন সময় দারকির মালিক মাছ নিতে এসে দেখে যে সব মাছ এনি সাপ খেয়ে ফেলেছে। এত রাগ হলো তার সে তখন ওটাকে লেজ ধরে এমন জোরে ছুড়ে দিল যে, অনেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

কোনো মতে প্রাণে বেঁচে উঠে এসে সে কালকূট বিষের খোঁজে গোবরের কাছে গিয়ে দেখে সব বিষ গোবর শুষে নিয়েছে।

সন্ত্রস্ত হয়ে সে যখন পদ্মদেবীর কাছে গিয়ে হাজির হলো। ছেলেকে দেখেই পদ্মদেবী বুঝতে পেরেছে কিছু একটা গরবর করে এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল, কি হে, খবর কী? তখন এনি সাপ তার বিপর্যয়ের ঘটনা সব খুলে বলল কাঁদ কাঁদ স্বরে।

যা হোক আরো নানা ঘটনা ঘটার পর বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশ তিথিতে মহা ধুমধাম করে বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হলো, বিবাহের পর বর বধূকে বাসর ঘরে আনা হলো। পদ্মদেবীর প্রতিজ্ঞা বানচাল করার জন্যে চাঁন্দ সওদাগর বাসর ঘরটির বাইরে নানা ভাবে পাহারা বসিয়ে ঘরটি আরো সুরক্ষার ব্যবস্থা করল। অন্যদিকে পদ্মদেবী তার কার্য উদ্ধারের জন্য আরো দৃঢ় ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে লেগে গেল। সে তার নাগ সৈন্যদের ডেকে ঘোষণা করল, কে আজ এই রাতে আমার হুকুম তামিল করতে পারে? ঘোষণা শুনে একটি এনি সাপ মাথা উঁচু করে বলল, মা আমি পারব।

খুশি হয়ে দেবী তখন তার গলায় রাখা আড়াই তোলা বিষ থেকে এক তোলা কালকূট বিষ দিল ছেলেকে এবং কীভাবে কামড়াবে লক্ষিন্দরকে এবং কীভাবে বাসর ঘরে প্রবেশ করবে তার জানা কৌশল শিখিয়ে দিয়ে ছেলেকে বিদায় দিল। এনি সাপ দ্রুত গতিতে ছুটে চলল। মাঝপথে এসে দেখে পথের পাশে নালায় একটি দারকি বসান আছে। তার মধ্যে নানা রঙের ছোট ছোট মাছ কিলবিল করছে। মাছ দেখে এনির ভারী লোভ হলো। সে ভাবল, রাত তো অনেক বাকি আছে, দু-একটা মাছ ধরে খেয়ে গেলে আর অসুবিধা কী? এই ভেবে সে তার মুখের কালকূট বিষ গোবরের উপর রেখে মাছ ধরার কাজে গেল। সে দারকির ভেতর ঢুকে মনের আনন্দে স্বাদের মাছ খেতে শুরু করল। এত মাছ খেল যে তার পেট ফুলে কলাগাছের মতো হয়ে উঠল। মাছ খাওয়া শেষ হলে তার মায়ের আদেশের কথা মনে পড়ল। সে দারকি থেকে বের হতে গেল। কিন্তু তার মোটা পেট নিয়ে আর দারকির ঘোরপ্যাচ থেকে বের হতে পারে না। ও প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে বের হতে। রাত ভোর হয়ে গেল। এমন সময় দারকির মালিক মাছ নিতে এসে দেখে যে সব মাছ এনি সাপ খেয়ে ফেলেছে। এত রাগ হলো তার সে তখন ওটাকে লেজ ধরে এমন জোরে ছুড়ে দিল যে, অনেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

কোনো মতে প্রাণে বেঁচে উঠে এসে সে কালকূট বিষের খোঁজে গোবরের কাছে গিয়ে দেখে সব বিষ গোবর শুষে নিয়েছে।

সন্ত্রস্ত হয়ে সে যখন পদ্মদেবীর কাছে গিয়ে হাজির হলো। ছেলেকে দেখেই পদ্মদেবী বুঝতে পেরেছে কিছু একটা গরবর করে এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল, কি হে, খবর কী? তখন এনি সাপ তার বিপর্যয়ের ঘটনা সব খুলে বলল কাঁদ কাঁদ স্বরে।

এনি সাপের কথা শুনে পদ্মদেবী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওর লেজ আর মাথা ধরে এমন ভাবে টান দিল, যে ওর মাথা সরু হয়ে গেল।

সেই থেকে এনি সাপের মাথা আর লেজ পেট অপেক্ষা সরু।

পদ্মদেবী তার সাপ সন্তানদের ডেকে আবার বলল, কে আছে যে আমার হুকুম ভালোভাবে তামিল করতে পার?

অসংখ্য সাপের মধ্যে ঢোড়াসাপ লাফ দিয়ে ওঠে বলল, আমি তোমার আদেশ পালন করব মা। সে গর্বিত কণ্ঠে বলল, তোমার আদেশ পেলে শুধু লক্ষিন্দর কেন আমি ওর গোষ্ঠী সুদ্ধ বাসর ঘরটাকেই গিলে ফেলতে পারি।

ঢোরা সাপের চোটপাট দেখে পদ্মদেবী একটু হেঁসে বলল, কাজের আগে যারা বড়বড় কথা বলে তাদের দিয়ে কাজ হয় না। তোকে দিয়েও এতো বড় কাজ হবে না। এত বড় দায়িত্ব আমি তোর উপর দিতে পারি না। তার চেয়ে তুই গিয়ে কালীদহ থেকে কালনাগকে ডেকে নিয়ে আয়?

আদেশ পেয়ে ছুটে চলল ঢোড়া সাপ। পদ্ম অপেক্ষা করে বসে আছে। দীর্ঘক্ষণ চলে যায় ঢোড়া আর ফিরে আসে না। পদ্ম ঢোড়া সাপের খোঁজে পাঠালো সংখরাজ সাপকে। সংখরাজ গিয়ে দেখে, কালনাগ সাপের বিষ বাতাস লেগে ঢোড়া বেহুস হয়ে পড়ে আছে কালিদহের পাড়ে।

ভাইকে সাথে নিয়ে যথাসময়ে কালনাগ এসে হাজির হলো মায়ের কাছে। পদ্ম এক তোলা কালকুট তার মুখে দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে কাজ করার নির্দেশ দিল। কালনাগ মায়ের আশির্বাদ আর আদেশ মাথায় নিয়ে তীব্র গতিতে ধাবিত হলো বাসর ঘরের দিকে। এদিকে রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। বাসরঘরের নিকটে দেখে ধাতুর কড়া পাহারা বসানো হয়েছে। একে তো লোহার বাসর ঘর, একটা পিঁপড়া ঢোকার ছিদ্র নেই তার উপর নিচে চারদিকে ময়ূর বেজি এবং অসংখ্য প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। এত কড়া পাহারা ভেদ করে কালনাগ কিছুতেই ঢুকতে পারল না বাসরঘরে। ফিরে এসে পদ্মকে জানাতে পদ্ম এবার ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। অবশেষে নিদ্রাদেবীর কথা মনে এল। নিদ্রাদেবীকে পদ্ম মাসি ডাকে। কেঁদে কেটে মাসিকে অনুরোধ করল বেহুলার বাসরঘরের চারপাশের সব প্রহরীদের চোখে ঘুম লাগিয়ে দিতে।

বোনজির কান্নাকাটিতে মন গলে গেল নিদ্রাদেবীর। সে সারা পৃথিবীতে ঘুমের বাতাস ছড়িয়ে দিল। পদ্ম তখন কালনাগকে বলল, এবার যাও, শীঘ্র করে যাও, আর কিছুক্ষণ পরই ভোর হয়ে যাবে। তবে আমি হেরে যাবো। আমার এতদিনের সব সাধ্যসাধনা সব জলে যাবে।

কালনাগ ছুটল আবার। বাসরঘরে পাশে এসে দেখে ময়ূর, বেজি, সেপাহী সকলেই ঘুমে অচেতন। বাসরঘরের দেয়ালে ঈশান কোণে চুলের মতো একটি ছিদ্র। পদ্মদেবীর নির্দেশ মতো কালনাগ ঐ ছিদ্রপথে ভিতরে প্রবেশ করল।

ঘরে প্রবেশিয়া নাগ নিরখিয়া চায়,
দেখে বালা লক্ষিন্দর সুখে নিদ্রা যায়।
রূপ দেখি কালনাগ হইল চমৎকার,
তবে হেন অঙ্গে কিসে করিব সংহার?
সাত পুত্রের মাতা আমি জাগে ত্রিভুবনে
কেমনে পরের পুত্র বধিব অকারণে?

কালনাগের খুব মায়া হলো। সে লক্ষিন্দরকে ছোবল না মেরে ফিরে এল পদ্মদেবীর কাছে। পদ্মদেবী বলল— কি হে, চাঁন্দয়ার বাড়িতে এখন কান্নার শব্দ শুনতে পাই না কেন?

কালনাগ সসম্মানে জবাব দিল, বিনা দোষে কালনাগ দংশে না, রীতি নাই। এটা-মহা পাপ।

পদ্ম রাগে ফেটে পড়ল— ওরে বেকুব, তোর অপরাধ খোঁজার প্রয়োজন কী? অপরাধ পেয়েছি আমি। পাপ-পুণ্য আমি বুঝব— তোকে যে কাজ করতে হুকুম করেছি তুই সেটা করবি।

বকাঝকার পর পদ্ম আবার পাঠাল ছেলেকে। এবার কাল নাগের সঙ্গে একটি মসাকে পাঠালো। কালনাগ ছুটে এসে আবার ঘরে ঢুকে দেখে জয়তুন তেলের ধোঁয়াহীন প্রদীপ জ্বলছে। ময়ূরকণ্ঠি সুন্দর পালঙ্কে বেহুলা লক্ষিন্দর তেমনি ঘুমে অচেতন।

এবার মশা পদ্মর কথামতো তার কাজ শুরু করল। সে পিনপিন করে পাখার শব্দ তুলে লক্ষিন্দরের কানের কাছে গান করে আর উড়ে উড়ে ওর পায়ে কামড়ে দেয়। মশার কামড়ে লক্ষিন্দর ঘুমের ঘোরেই পা দাপায়, লাথি মেরে মশাকে তাড়ায়। সেই লাথি গিয়ে পড়ল কালনাগের গায়ে। এবার কালনাগ তার বিষদাঁত বসিয়ে দিল লক্ষিন্দরের পায়ে।

সাথে সাথে বিষে নীল হয়ে গেল লক্ষিন্দরের সারা শরীর।

সকালে ঘুম ভাংলো বেহুলার। ঘুম ভেংগে দেখে লক্ষিন্দরের নীল হয়ে যাওয়া মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে। বেহুলা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

'জাগিয়া উঠিল সতী হয়ে তৎপর,
দেখে কি করিছে তার প্রভুধর।
শীতল পাষাণসম দেখে সর্বগায়,
উলটিয়া গেছে চক্ষু দেখি ভয় পায়।
চিন্তিত হইল সতী না বুঝিয়া কারণ,
দুই হস্তে ধরিলেন প্রভুর চরণ।
মুখ বুক ভেসে গেল নয়নের নীরে,
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কত নিদ্রা যাও
নিশি অবসান হলো আঁখি মেলে চাও।
দেখিয়া তোমার অঙ্গে এসব লক্ষণ
সহিতে না পারি প্রাণ করে উচাটন।
উঠ উঠ বলি তোমা ডাকি প্রাণেশ্বর,
কেন অভাগীরে তুমি না দাও উত্তর।

বেহুলার করুণ কান্না শুনে ছুটে এল সানুকা, চাঁন্দ সওদাগর অন্যান্য সভাসদ, রাজ্যের সব লোকজন। অনেক বুক ফাটা আর্তনাদ হলো, কান্নাকাটি হলো, অবশেষে চাঁন্দ সওদাগর লক্ষিন্দরের শবদেহ দাহ করার জন্যে শ্মশানে নিয়ে যেতে আদেশ দিল। আদেশ শুনে পতিব্রতা বেহুলা ছুটে এসে শ্বশুন্দের পায়ে পড়ে মিনতি করল, লক্ষিন্দরকে না পোড়াতে। দৃঢ়ভাবে বলল, যদি আমি সতী হই তবে অবশ্যই আমার স্বামীকে আমি বাঁচয়ে তুলব। আমি মৃত স্বামীকে নিয়ে দেবপুরীতে যাব।

বেহুলার আবেদন নিবেদনে অবশেষে চাঁন্দ সওদাগর রাজি হলো। সওদাগরের আদেশে একটি কলার ভেলা তৈরি করা হলো। সেই ভেলায় খাদ্য, পানি, দেবতাদের পূজার সরঞ্জাম দিয়ে ভাসিয়ে দিল নদীতে। সে ভেলায় শুধু বেহুলা আর তার মৃত স্বামী। নেই কোনো মাঝি মাল্লা, কিংবা দাড়-বৈঠা।

বেহুলার ভেলা নদীর স্রোতে ভেসে চলল উজানের দিকে।

দিন যায়, মাস যায়, বেহুলার ভেলা চলতেই থাকে, ভাসতে থাকে ঢেউ এর তালে তালে।

এমনি চলতে চলতে একদিন এক ঘাটে গিয়ে লাগল। ঘাটে এক ধোপিন কাপড় ধুচ্ছে। বেহুলার ভেলা আর বেহুলাকে দেখে নদীর কিনারে যে এক বক

বলেছিল সে উড়ে গেল ভয়ে। ধোপিনী রেগে গেল বেহুলার ওপর। চড়া গলায় শুধায়—এ ঘাটে মারতে এলে কেন? তোমার জন্যেই তো বক উড়ে গেল।

বেহুলা কারণ জানতে চাইলে ধোপিনী বলে, আমি ঐ বক দেখি আর কাপড় ধুই। যতক্ষণ কাপড় বকের মতো সাদা না হয় ততক্ষণ ধুতে থাকি।

ধোপিনীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে বেহুলা এগিয়ে এল। কাছে আসতে সে একটি বিষয় দেখে বিস্ময়ে হতবাক। দেখে ধোপিনী তার শিশু পুত্রকে পিঁড়ির নিচে ফেলে তার উপর কাপড় ধুচ্ছে। কাপড় ধোয়া শেষ করে ধোপিনী কী এক জাদুর কাঠির স্পর্শে মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল।

এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখে বেহুলা ভাবল, এই মহিলা সামান্য নারী নয়। নিশ্চয় কোনো দেবী। বেহুলা ছুটে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল, দয়া কর মা, দয়া কর এই হতভাগীকে।

ধোপিনী জিজ্ঞেস করল, কে তুমি? কাঁদছ কেন? আর তোমার সাথে ঐ মৃত দেহটা-ই বা কার?

বেহুলা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—

বিয়ার রাতে পতিকে মোর খাইল নাগিনী,
পতিলয়ে ভেসে যাই আমি অভাগিনী।
কী আর কহিব মাসী-তোমার নিকট,
অভাগিনী-নারী আমি পড়েছি সংকট।

বেহুলা আরো বলল, ঐ ভেলায় আমার মৃত স্বামী। বাসররাতে পদ্মদেবীর কালনাগে আমার স্বামীকে দংশন করে তার প্রাণ নেয়। আমি মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ির কাছে শপথ করে এসেছি, দেবতাকে তুষ্ট করে আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনব। মা তুমি দেবী, তুমি আমাকে সাহায্য কর।

বেহুলার করুণ কাহিনী শুনে নেতাই ধোপিনীর মনে একটু মায়া হলো। সে বলল, শোন মেয়ে, কালনাগ দংশন করলে তাকে ভালো করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে একটা উপায় আছে, তুমি যদি শিবকে তোমার নৃত গীত দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পার তাহলে শিব তোমার স্বামীকে জীবন দিতে পারবে।

কোথায় পাব মা আমি শিবের দেখা, বলে দাও মা'। বেহুলার বিলাপে ধোপিনী বলল, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি দৈবালয়ে শিবের দরবারে, তবে সেটা আজ নয়, কিন্তু তুমি থাকবে কোথায়? আজ রাতটা তুমি আমার বাড়িতে থাকতে পার। বেহুলা খুশি হয়ে ধোপিনীর বাড়ি চলল।

এই নেতাই ধোপিনী হচ্ছে শিবের এক কন্যা। ওর স্বামীর নাম শঙ্খমুনী। ধনা নামে তাদের অতি দুষ্টু এক শিশুপুত্র আছে। ওকে কাজের সময় ধোপিনী মৃত করে কাজ করে, কাজ সারা হলে জীবিত করে ঘরে ফেরে।

তো পরদিন যথারীতি কাপড় ধোয়ার জন্য নেতাই ধোপী যখন ঘাটে যেতে তৈরি হলো, বেহুলা এসে অনুনয় করে বলল, মাসি আজকের কাপড়গুলো আমি ধুয়ে আনি। নেতাই বলল, না, না, তুমি পারবে না। এ দেবতাদের কাপড়। দেববস্ত্র নষ্ট হলে আমাকে অপমানিত হতে হবে।

বেহুলা বলল, মাসি তুমি যদি আশির্বাদ কর তাহলে অতিসুন্দর ভাবে আমি কাপড় ধুতে পারব। তোমাকে কোনো অপমানিত হতে হবে না।

বেহুলার অনুনয় বিনয়ে অবশেষে ধোপিনী বেহুলাকে ঘাটে পাঠাল কাপড় ধুতে। বেহুলার ধোয়া কাপড় যখন নেতাই ধোপিন দেবপুরিতে নিয়ে দিল। দেবতা শিব দেখে অভিভূত হয়ে—

শিব বলে নেতা তুমি কহ মোর কাছে
আজিকার বস্ত্রগুলি কেবা ধুইয়াছে।
নেতা বলে, মোর ঘরে আসিল নর্তকী,
ত্রিভুবনে হেনরূপ কভু নাহি দেখি।
বসন ধুইয়া দিল আজকার দিনে,
বর্ণনা হয় না তার দরকান বিনে।
সুন্দরী শুনে শিব চমকিল মন,
কহিতে লাগিল হেসে নেতার সদন।
কালকেই তুমি তারে আন দেবপুরী,
নৃত্য করি যাহা মাগে-পাইবে সুন্দরী।

দেবতার আস্থা পেয়ে নেতাই ধোপী বেহুলাকে অপূর্ব করে সাজসজ্জা করতে বলল। সুন্দরী বেহুলা ইন্দ্রকে জয় করতে যাচ্ছে। সে অপূর্ব সাজে সাজ করল।

শিব অন্যান্য সকল দেবতাকে বেহুলা সুন্দরীর নাচ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সকলে যথা সময়ে অনুষ্ঠানে হাজির হলো। হাজির হলো না শুধু পদ্মদেবী। সে বিশেষ সূত্রে খবর জেনেছে যে, ঐ সুন্দরী নর্তকী আর কেউ নয় সে বেহুলা। হয়তো সে তার স্বামী হত্যার বিচার দিতে পারে দেবলোকে। এই সব চিন্তা করে সে তার বিছানার নিচে পাটকাঠি বিছিয়ে শুয়ে রইল অসুখের ভান করে। ঠিক এমনি সময়ে তার ঘরে এল নারদ মুনিসহ কার্তিক ও গণেশ-নামের তার দুই ভাই।

তারা বলল, দিদি তোমাকে আজ দেবপুরিতে যেতেই হবে। পিতার আদেশ। স্বেচ্ছায় তুমি না গেলে পিতার আদেশে বাধ্য করব আমরা তোমাকে যেতে আরো বলে—

"মুণি বলে পদ্মদেবী কর অবধান,
উঠিয়া ঔষধ তুমি কর শীঘ্র পান।
তোমার বাপের ঘরে লাগিছে উৎসব,
তুমি গেলে কতমতে বাড়িবে গৌরব।
ছলনা করিতে চাও জৈষ্ঠা ভাইসনে,
এ চাতুরী বিশ্বাস করিবে কোনো জনে।

ভাইদের কাছে ছলনা ধরা পরার পর আর কী করে। উঠে দেবপুরির জলসায় যাওয়ার জন্যে সাজ গোজ করতে লাগল। যথাসময়ে দেবপুরির জলসায় উপস্থিত হলো।

বেহুলা সুন্দরী অপূর্ব ভঙ্গিমায় বিভিন্ন নাচ দেখতে শুরু করল।

বেহুলার অপূর্ব রূপ আর নাচের পারদর্শীতা দেখে শিব মুগ্ধ হলো। নাচ শেষে শিব অঢেল ধনরত্ন নর্তকীকে উপহার দিল। কিন্তু বেহুলা এসব ধনরাজি নিতে অস্বীকার করে মিনতি করে বলল—

"শোন শোন ব্রহ্ম বিষ্ণু দেব পঞ্চানন,
পৃথিবীতে খ্যাত আছে চম্পক ভুবন।
চাঁন্দ নামে সেথা আছে এক সওদাগর,
পদ্মর সহিত তার বিবাদ বিস্তর।
পদ্মর উপর তার ভক্তি নাই প্রাণে,
দেবতা, বলিয়া সাধু পদ্মারে না মানে।
সেই দুঃখে পৃথিবীতে গিয়ে পদ্মবর্তী
কত মনে সওদাগররে দিলেন দুর্গতি।
এমনি করে সকল ঘটনা বর্ণনার পর বলল,
পদ্মর নিকটে শ্বশুর দোষী হতে পারে,
কেননা সে পূজা কভু নাহি দিল তারে।
কিন্তু বিনা দোষে মোর স্বামী হল নাশ,
বড় দুঃখে আসিয়াছি দেবতা সকাশ।
বিচার করা সবে দেবধর্ম মতে,
ধন আমি নাহি চাই দেবতার নিকটে।

বেহুলার কথা শুনে দেবতাগণ অভিভূত হয়ে গেল। শিব খুশি মনে বলল, চাঁদ সওদাগর আমার পুত্র তুল্য শিষ্য। দেব আরো বলল,

পতির কারণে তুমি না ভাবিন্ত আর,
ত্রিভুবনে যত শক্তি মম অধিকার।
আমার হইয়া তুমি থাক মোর ঘরে
সব দুঃখ যাবে দূরে কহিনু তোমারে।

বেহুলার বক্তব্য শুনে অনেক তর্ক বিতর্কের পর দেবগণ সিদ্ধান্তে এলেন যে, চাঁন্দ সওদাগর যদি আমাকে পূজা না দেয় সে অপরাধ বেহুলা বা লক্ষিন্দরের নয়। অতএব, পদ্ম যেহেতু বেহুলার সব দুর্দশার কারণ সুতরাং এ পদ্মদেবীর দায়িত্ব লক্ষিন্দরকে জীবন্ত করে তোলার।

দেবগণের রায় শুনে বেহুলা গিয়ে পদ্মর পায়ে পড়ল বলল, — মা আমি তোমার পুজো দেব। আমার শ্বশুরকেও তোমার পুজো দিতে বাধ্য করব। আমি কথা দিচ্ছি, তিনি যদি তোমার পুজো না দেন তবে আমি তার বাড়ি ফিরে যাব না। আমরা আবার এই দেবালোকে ফিরে এলে তোমার পুজো দেব মা।

বেহুলার এ মধুর কথায় পদ্মদেবী খুশি হয়ে লক্ষিন্দরকে আবার জীবন্ত করে দিল।

স্বামীকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে পদ্মর জয়ধ্বনিতে দেবপুরী মুখরিত করে তুলল। দেবপুরীতে খুশির বান ডেকে গেল।

তারপর বেহুলা পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে চলল শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে সেই ভেলায় করে।

ভাটির স্রোতে আনন্দমুখর ভেলাখানি ছুটে চলল, কালিদহ সাগরে এসে ভেলা আর চলে না।

কিছুতেই এগোয় না। কারণ এই সেই স্থান সেখানে ডুবেছিল চাঁন্দ সওদাগরের ছয়পুত্র, চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর্তি মালসামান।

বেহুলার চোখে ভেসে উঠল শ্বশুরঘরে আরো ছয় বিধবার চেহারা।

লক্ষিন্দরের শবদেহ ভেলায় করে ভাসার আগে বেহুলা এক মুঠো সিদ্ধধান শ্বশুরের হাতে দিয়ে বলেছিল, এই সিদ্ধধান জমিতে বুনে দেবেন। যদি দেখেন যে সিদ্ধধান থেকে চারা গজিয়েছে তবে বুঝবেন, আমি আমার জীবিত স্বামীসহ ফিরে আসব। আজ চাঁন্দ সওদাগর আশায় বুক বেঁধে আছে। বেহুলা পদ্মদেবীকে আবার অনুরোধ করল, তার স্বামীর ছয় ভাইকে

ফিরিয়ে দিতে। তাদের জীবিত করে শ্বশুরের ডুবে যাওয়া ধনরতন তুলে দিতে। পদ্মদেবী বেহুলার স্বামী-ভক্তি আর ব্যবহারে এতটাই মুগ্ধ যে সে আবার মন্ত্রবলে চাঁন্দ সওদাগরের ছয়পুত্র, চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরসহ ধনরাজি কালিদহ সাগর থেকে তুলে দিল। সকলকে নিয়ে চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনরাজি নিয়ে চম্পক নগরের ধর্মঘাটে এসে ভিড়ল ভেলা।

চম্পক নগরের সকল জনগণ, সানুকা, সভাসদ সকলে ধর্মঘাটে এসে উপস্থিত হলো বেহুলা লক্ষিন্দরকে অভ্যর্থনা জানাতে। একমাত্র চাঁন্দ সওদাগর ঘাটে গেল না। কারণ সে জানতে পেরেছে ভেলায় পদ্মদেবীও আছে। পদ্মর মুখ সে দর্শন করবে না। চাঁন্দ সওদাগর যখন শুনল বেহুলার সঙ্গে পদ্মও তার বাড়ির দিকে আসছে তখন সে ক্রোধে তার হেমতালের লাঠির খোঁজ করল। কিন্তু হেমতালের লাঠি তার হাত থেকে খসে পড়ল। ততক্ষণে বেহুলা নেতাই, সানুকা এবং সভাসদেরা তার গৃহে উপস্থিত হলো। সকলে একযোগে চাঁন্দ সওদাগরকে অনুরোধ করতে নাগল পদ্মকে পুজো দেয়ার। অসহায় চাঁন্দ সওদাগর নতমুখে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, পুজো দিতে পারি তবে ডান হাতে নয় বাম হাতে।

পুজোর আয়োজন হলো। পদ্মর মনে আজ খুশির বান, আজ থেকে ঘরে ঘরে শুরু হবে মনসাদেবীর পুজোর প্রচলন। কিন্তু দুঃখ এখন মনে চাঁন্দ পুজো দিচ্ছে কিন্তু খুশি মনে দিচ্ছে না।

চাঁন্দ সওদাগর যখন পুজোর ফুল ডান হাত থেকে বাম হাতে নিতে যাবে, পদ্ম বলল, তুমি আমার ভক্ত। ফুলের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তোমার মন। যাই হোক বেহুলার মতো পতিভক্ত দেবীভক্ত পুত্রবধূ পেয়েছ। আমি আশির্বাদ করি ধনে মনে তুমি এমনিতেই সুখে থাক।

পদ্মর কথা শুনে বিমূঢ় হয়ে গেল সওদাগর। তার ডান হাতের ফুল আর বাম হাতে নেয়া হলো না।

তারপর থেকে মর্তলোকে মনসা বা পদ্মদেবীর পুজো প্রচলন হলো আর চাঁন্দ সওদাগর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

CamScanner

তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য পত্রিকা 'সচিত্র সন্ধানীতে'। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘদিন তিনি আইন বিষয়ে কথিকা উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণি- চারুপাঠ গ্রন্থে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোন' গ্রন্থের অংশ বিশেষ পাঠসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯৬ সালে 'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ'।

বাংলা একাডেমির গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত তাঁর 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র' গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স বই হিসেবে পঠিত হয়।

বাংলাদেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় গবেষক হিসেবে ২০১০ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে 'পিপল টু পিপল কান্ট্রাক' প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। Indian Institute of Technology Guwahati, শিলং ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ লেকচার দেন।

২০০৮ সালে আমেরিকা ভিত্তিক মুক্তধারা কাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব উদ্বোধন করেন জ্যামাইকায়। ২০১০ সালে ফিলিপিনে 5th Conference of Lawyers in Asia Pacific গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৯৮৬ সালে United states Library of Congress এ সাহিদা বেগম এর জীবন ও সাহিত্যকর্ম স্থান লাভ করে।

তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমি, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি, ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির জীবন সদস্য। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সহসভাপতি, কমনওয়েলথ লইয়ার্স এসোসিয়েশন লন্ডনের সদস্য, লইয়ার্স রাইটার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ